গন্ধরাজ

গল্প-গ্রন্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট --- কলিকাতা-৬

তিন টাকা

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ব্লক :
ভারতবর্ষ হাফটোন ওআর্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৬২

সূচী

ধস্

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। গায়ের গরম ব্লাউজটার ওপরে পাতলা বর্ষাতিটা চাপিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল কিরণলেখা। তারপর থেমে দাঁড়াল দু' সেকেণ্ডের জন্যে। মুখ না ফিরিয়েই বললে, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

কেউ সাড়া দিল না—সাড়া পাওয়ার জন্যে অপেক্ষাও করল না কিরণলেখা। এক ঝলক হাওয়ার মতো প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে সে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। নীল বর্ষাতিটা ডুবে গেল নীল্‌চে কুয়াশার আড়ালে।

একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল কি দেখল না ভবতোষ। বালিশে পিঠ উঁচু করে যেমনভাবে শুয়ে ছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে রইল। শুধু তার হাতে খবরের কাগজের একটা পাতা উলটে গেল একবার। কাগজের খচ্ খচ্ আওয়াজটা কেমন তীক্ষ্ণ ঠেকল কানে, একবারের জন্যে কুঁকড়ে উঠল ভবতোষের কপাল, তারপর জেনেভা বৈঠকে কেন্দ্রিত মনটা অসতর্কভাবে পিছলে পড়ল একটা কোম্পানির রিডাকশন সেলের বিজ্ঞাপনে।

ঘরটা চুপচাপ এইবার। আঙুলের চাপে একটুও খর্ খর্ করে উঠল না কাগজটা। বাইরে নিঃশব্দ বৃষ্টি। সব চুপ। কাচের জানালার বাইরে আবছা আবছা পেনসিলের টানের মতো ইলেকট্রিকের তারগুলো, একটা মেঘলা পাইন গাছের চূড়ো, রাস্তার ওপারে একখানা ভাঙা মোটরের হুড্—সব যেন নিঝুম হয়ে গেল

একসঙ্গে। আধশোয়া শরীরে একটা স্তব্ধ সমকোণ রচনা করে জুতোর বিজ্ঞাপনে ডুবে রইল ভবতোষ।

আর কী করতে পারে—কী করবার আছে ওর। দেড় বছর যদি চাকরি না থাকে, যদি দৈনিক কয়েকটা সিগারেটের পয়সার জন্যে হাত পাততে হয় স্ত্রীর কাছে, যদি জীবনটা চারদিক থেকে একটা শক্ত থাবার মতো কুঁকড়ে আসতে থাকে—তা হলে। তা হলে তিনদিনের পুরনো একটা খবরের কাগজকে পরীক্ষার পড়ার মতো লাইনে লাইনে মুখস্ত করা ছাড়া কী করা চলে আর! সিনেমার খবর, জুতোর দাম, পাটের বাজার, জেনেভা বৈঠক আর সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ—সমস্ত একাকার হয়ে যায়। শুধু থেকে থেকে গালে দু'দিনের দাড়ি অস্বস্তির চমক দিয়ে ওঠে—মুহূর্তের জন্যে তালগোল পাকিয়ে যায় খবরের কাগজের লাইনগুলো, আর মনে হয়—বলা যায় না। ছ' পয়সার একখানা ব্লেডের কথা কিছুতেই বলা যায় না কিরণ-লেখাকে।

আশি ডিগ্রির বিস্তৃতি থেকে এবার ষাট ডিগ্রিতে নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে আনল ভবতোষ। কাগজটা খসে পড়ল মেঝের ওপর। আবার খানিকটা খচ্ খচ্ খর্ খর্ শব্দ। কেমন যেন কানে লাগল ওর। ভবতোষ আজকাল অদ্ভুত রকম স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে। সেদিন জানালার কাচে ডেঙ্গুর মশার মতো কী একটা বসে ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছিল, ওইটে গায়ে এসে পড়লে অস্বাভাবিক গলায় একটা চিৎকার করে উঠবে সে।

এই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন? এরই জন্যে কি মানুষ জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে? এরই জন্যে কি একটা কালো বেড়াল যখন-তখন ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, দেওয়ালে নিজের ফটোটা বদলে গিয়ে একটা মরা-মানুষের মুখে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই জন্যেই কি নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে দু' হাতে? একটা

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাইল ভবতোষ।

যে কারণে একদিন কিরণলেখা তীব্র আকর্ষণে টেনেছিল ভবতোষকে—আজ ঠিক সেই কারণেই নিজেকে বড় বেশী পরাভূত মনে হয় ভবতোষের। পোস্ট গ্রাজুয়েটের দেড়শো ছেলের ঈর্ষ্যাভরা দৃষ্টির সামনে কিরণলেখা ভবতোষের জীবনে এসেছিল। ঠিক স্ত্রী হয়ে নয়—প্রতিপক্ষের মতো। ভবতোষকে সে মেনে নেবে না—মানিয়ে নিতে হবে। পুরুষের মতো লম্বা শক্ত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে একটা স্তব্ধ উগ্রতা—নিরলঙ্কার কাটা-ছাঁটা ভাষা। বইয়ের পাতা থেকে মিনিট খানেকের জন্যে চোখ তুলে শুনেছিল বিয়ের প্রস্তাবটা। তারপর একটা লাল পেন্সিল তুলে নিয়ে মার্জিনে দাগ দিতে দিতে বলেছিল, আমার আপত্তি নেই। তবে মাস তিনেকের আগে নয়।

ভবতোষ উচ্ছ্বসিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল কিরণলেখা। দৃষ্টিতে একটা নিরুত্তাপ শাসন।

—পড়ার সময় আর বিরক্ত কোরো না। কথা তো হয়ে গেল—এবার যেতে পারো।

কিরণলেখার হাত প্রথম মুঠোর মধ্যে নিতে পেরেছিল ভবতোষ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। ভবতোষের হাত কাঁপছিল, কিন্তু কিরণলেখার কঠিন আঙুলগুলোতে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্যের ছোঁয়া ছিল না। সেদিনও নয়—তারপরেও নয়। তিন বছর ধরে সহজ স্বাভাবিক চুক্তির মতো ঘর করছে দু'জনে। ভবতোষ একটা চলনসই চাকরি জুটিয়েছে—মেয়েদের স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস হয়েছে কিরণলেখা। সসম্মানে সংসার করেছে দু'জন—কারো কাছে কাউকে মাথা নিচু করতে হয় নি।

তারপর চাকরি গেল ভবতোষের। অফিস থেকে বেরিয়ে এসে

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডালহৌসি স্কোয়ারের রেলিঙে হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে লাগল জি-পি-ওর ঘড়ির কাঁটা দুটোর লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাওয়া। তারপর প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল—এখন? এইবার?

অন্নাভাব হয়তো আসবে না—একটার জায়গায় না হয় তিনটে প্রাইভেট পড়ানো জোগাড় করে নেবে কিরণলেখা। কিন্তু কোন্ মর্যাদা নিয়ে এখন দাঁড়িয়ে থাকবে ভবতোষ—দাঁড়াবে আত্মসম্মানের কোন্ শক্ত ডাঙার ওপরে? এক প্যাকেট সিগারেট—একখানা ব্লেড্—

না—চাকরি আর জোটেনি। চাকরি না পাওয়ার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা যাদের আছে, হয়তো ভবতোষ তাদেরই একজন। দু' একবার মুঠোর কাছাকাছি এসেও হাত পিছলে বেরিয়ে গেছে সুযোগ। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েই দিয়েছে ভবতোষ। কিরণলেখার কাছ থেকেই নিতে হয়েছে সিগারেটের দাম—ব্লেডের খরচ। আর চুক্তি নয়—বশ্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—আত্মসমর্পণ। কিরণলেখার শান্ত করুণার ছায়ায় দিনের পর দিন নিভে গেছে ভবতোষ, গভীর স্নায়বিক শ্রান্তিতে সারা রাত কান পেতে শুণেছে কতগুলো মড়া সারারাত কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে চলে গেল।

এরই নাম নার্ভাস ব্রেক-ডাউন? টান-টান করে বাঁধা পৌরুষের তারগুলো হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার এই পরিণাম? এরই জন্যে কি দেওয়ালে নিজের ফোটোগ্রাফটাকে হঠাৎ একটা মড়ার মুখের মতো মনে হয়, এই জন্যেই কি যখন-তখন ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় একটা কালো বেড়াল, এই জন্যেই কি একটা বিষাক্ত নেশার পীড়নের মতো কখনো কখনো ইচ্ছে হয়—

কিরণলেখা কর্তব্যে ত্রুটি করেনি। এক মাসও বাকি পড়েনি

বাড়িভাড়া, বাদ যায়নি এক সপ্তাহের রেশন। যেমন আসত তেমনি করেই মাংস এসেছে প্রত্যেক রবিবারে। হয়তো দুটোর জায়গায় পাঁচটা প্রাইভেট ট্যুইশান নিয়েছে কিরণলেখা—ভবতোষ জানেও না। আগেও যেমন রাত ন'টার পরে সে বাড়ি ফিরত—এখনো তাই ফেরে। হয়তো মাঝখানের ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রামটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে।

আর নিজের ভয়াবহ মনোমন্থনের মধ্যে মধ্যে ভবতোষ ভেবেছে তার নিজের অক্ষমতা সংসারে তো এতটুকুও ফাঁকার সৃষ্টি করেনি। এতবড় যন্ত্রটার একটা চাকাও কোথাও অচল হয়ে যায়নি তো। একবারও তো কিরণলেখা মুখ ফুটে বলেনি সংসারে বড্ড টানাটানি যাচ্ছে আজকাল। তা হলে কি ভবতোষ আদৌ না থাকলেও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটত না কিরণলেখার? কল্পনা করতেই আহত পুরুষ আর্তনাদ করে উঠেছে বুকের ভেতরে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমকে মনে হয়েছে—তা হলে আজ সে শুধুই ভার, একটা অনাবশ্যক বোঝা ছাড়া কিছুই নয়!

শেষ পর্যন্ত চোখ পড়েছে কিরণলেখার। ভবতোষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ডাক্তার এসেছে বাড়িতে।

—চেঞ্জে নিয়ে যান।—একটা টনিকের সঙ্গে ডাক্তারের প্রেস্-ক্রিপশন।

—চেঞ্জে!—উচ্চকিত হয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ভবতোষ। ফুটবল ম্যাচ্ দেখা ছেড়ে দেবার পরে এত জোরে সে-কখনো আর চিৎকার করে ওঠেনি।

চোখের দৃষ্টিতে স্তব্ধ উগ্রতাটাকে উগ্রতর করে তাকিয়েছে কিরণ-লেখা। শীতল কণ্ঠে বলেছে, সে যা করার আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবেনা।

ভাবতেও হয়নি ভবতোষের। কোথা থেকে টাকা জোগাড় করেছে,

ঘরভাড়া করেছে, তারপর এই গরমের ছুটিতে ভবতোষকে নিয়ে এসেছে দার্জিলিঙে—সে-সব কিরণলেখার একার দায়িত্ব। একটা টাকার হিসেব করতে হয়নি, এমন কি পথে কুলির সঙ্গে দরাদরি পর্যন্ত করতে হয়নি ভবতোষকে। চুক্তির পর্ব শেষ হয়ে গেছে—এখন বশ্যতার পালা। আগে নিজের ব্যক্তিত্বকে তলোয়ারের মতো শান দিয়ে রাখতে হত—এখন চলছে কাটা-সৈনিকের ভূমিকা। কিরণলেখার স্নেহচ্ছায়ায় এখন তার তিলে তিলে নির্বাণ আর অলস-কল্পনায় ইন্ধন দিয়ে দিয়ে ভাবা: নিজের সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ করবার মতো দুটো ভালো কবিতার লাইন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

মেঝে থেকে একবার খবরের কাগজটাকে কুড়িয়ে নেবার কথা ভাবল ভবতোষ, কিন্তু উৎসাহ পেল না। নিস্তব্ধ ঘরের শীতল অবসাদের মধ্যে সে তলিয়ে রইল, আর তাকিয়ে দেখতে লাগল বাইরের নীলাভ কুয়াশায় আবছা রেখায় আঁকা নিঃস্পন্দ ইলেক্‌ট্রিকের তার, একটা পাইনগাছের কালির ছোপ, একটা ভাঙা মোটরের হুড্, আর—

কিরণলেখা জানত রণজিৎ অপেক্ষা করবে। কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না—এমন কি এক বিন্দু আভাস পর্যন্ত দেয়নি কিরণলেখা। তবু লাডেন্ লা রোডের রেলিং ধরে রণজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল। এই অল্প অল্প বৃষ্টি—থেকে থেকে ঘনিয়ে আসা কুয়াশা—কোনো এক কাক-জ্যোৎস্নায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কবরের মতো নীচের বাড়িগুলো আর দূরের ঝাপসা বিষণ্ণ পাহাড়—এরা এমন কিছু আকর্ষণের বস্তু নয় রণজিতের কাছে। প্রায় নির্জন পথের ওপর রণজিতের মূর্তিটা কুয়াশায় অদ্ভুত দীর্ঘকায় মনে হল। যেন বিরাট কোনো এক সমাধি-ভূমিতে একটা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

—এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন ?

কেমন চমকে উঠল রণজিৎ। কেন, কে জানে। হয়তো আগে থেকে কিরণলেখাকে দেখতে পায়নি, সেই জন্যেই ; হয়তো কিরণলেখা আসতে পারে এই কল্পনাতেই তদ্গত হয়ে ছিল সে—এসে পড়ার বাস্তবতাকে ঠিক সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না।

রণজিৎ বললে, আপনি ?

অভিনয়। কিরণলেখা অল্প একটু হাসল : মাছের সন্ধানে বেরিয়েছি। যাব বাজারের দিকে।

—মাছ ? এই দুপুরবেলায় ?

—দার্জিলিঙের বাজারে এই সময়েই মাছ আসে। আপনি হোটেলে থাকেন, তাই এ-সব খবর জানবার দরকার হয়না। কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছেন আপনি ?

—আমি ?—রণজিৎ কেমন ঘোলা চোখে তাকালো। অথবা ওর চশমার কাচের ওপর রেণু রেণু বৃষ্টি জমেছে বলেই অমন আবছা দেখাল ওর চোখ : দার্জিলিঙে এমনি অল্প অল্প বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে।

অভিনয় ? কিরণলেখা এবার আর হাসল না, ফেলল শান্ত বিশ্লেষণের দৃষ্টি।

—কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে। জ্বর হয়ে বসতে পারে চট্ করে।

—জ্বর ? আজ কুড়ি বছরের মধ্যে একদিনও আমার মাথা ধরেনি—বেশ ভরাট্ পরিতৃপ্ত গলায় বললে রণজিৎ। আবার খানিকটা কুয়াশা এসে রণজিৎকে আড়াল করে দিলে—আবার তাকে অদ্ভুত রকম দীর্ঘকায় বলে মনে হল কিরণলেখার।

কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হল। হঠাৎ যেন কিরণলেখা অনুভব করল, এখনি দুটো বিশাল বলিষ্ঠ বাহুতে রণজিৎ তাকে তুলে নিতে

পারে, তারপর নিছক খেয়ালের প্রেরণায় ছুড়ে দিতে পারে সামনের কোনো একটা অতল শূন্যতার ভেতরে। এবং পরক্ষণেই, যেন একটা প্রকাণ্ড কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছে এমনিভাবে, এই কুয়াশা, ওই বাড়িগুলো, দূরের ওই বিষণ্ণ পাহাড়—সব কিছুকে চকিত করে দিয়ে হেসে উঠতে পারে হা হা করে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল কিরণলেখাই : আর কতদিন থাকবেন এখানে ?

—কিছু ঠিক করিনি এ-পর্যন্ত। এখনো লম্বা ছুটি রয়েছে হাইকোর্টের। যদি ভালো লাগে, হয়তো আরো দু' সপ্তাহ কাটিয়ে যেতে পারি।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সে রণজিৎ নয়—কিরণলেখা ভাবল। কোনো মেয়ে কাছে গিয়ে লেক্‌চার নোটের খাতা চাইলে যে রণজিতের মুখের রঙ্‌ বদলাত বহুরূপীর মতো, করিডোরে কথা কইতে গেলে যার কপালে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে উঠত, টেলিফোনে কিরণলেখাকে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে যে নিজে তিন-তিনবার কানেক্‌শন কেটে দিয়েছে, সেই লাজুক শান্ত ছাত্রটির সঙ্গে কোনো মিল নেই এই রণজিতের। জীবনের নতুন নাটকে আজ সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেছে তার। এখন সে হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। আত্মবিশ্বাস এসেছে—এসেছে আত্মপ্রকাশের শক্তি। জনশ্রুতি শোনা যায়, ভবতোষের সঙ্গে কিরণলেখার বিয়ের পরে সমানে তিনদিন ধরে বেহালা বাজিয়েছিল রণজিৎ। আজ সেই বেহালার স্মৃতিচিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো এখন রিভলভারের লাইসেন্স নিয়েছে রণজিৎ—হয়তো আজকাল সে গ্রে-হাউণ্ড্‌ পোষে বাড়িতে।

কিরণলেখা বলে ফেলল, চলুন, আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত।

কথাটা বলেই মনের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল কিরণলেখা। এই প্রস্তাবটা আসা উচিত ছিল রণজিতের কাছ থেকেই। মোলায়েম বিনীত গলায়, কুণ্ঠিত মিনতিতে। তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে, প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত স্মিত হাসিতে কিরণলেখা বলত, বেশ—চলুন।

কিন্তু কেমন উলটো হয়ে গেল ব্যাপারটা। কে জানত, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ক্লাশ ঘরে কুঁকড়ে থাকা অঙ্কুরটা দার্জিলিঙের কুয়াশায় পাইনগাছের মতো মাথা তোলে! তেমনি ঋজু, তেমনি উর্ধ্বমুখী!

যে-হাসিটা কিরণলেখার ছিল, নিজের পৌরুষে সেইটে কেড়ে নিয়ে রণজিৎ বললে, চলুন না, ভালোই তো।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এক ফালি মেঘভাঙা রোদ পড়ল চকচকে পথের ওপর। মেঘ আর কুয়াশায় মিলে আকাশ-মাটি ছাওয়া শাদা পর্দাটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। রণজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—চা খাবেন?

—থাক এখন।

—থাকবে কেন? আসুন না। কি রকম কন্‌কনে ঠাণ্ডা দেখেছেন! একটু চা নইলে উৎসাহ বোধ হচ্ছে না।

ঠিক তাই। নিজেকে কেমন স্তিমিত মনে হল কিরণলেখারও। প্রতিবাদ করল না।

রাস্তার ডানদিকে এক ধাপ নেমে সাজানো ছোট একটা রেস্তোরাঁ। শো-কেসে একখানা অতিকায় পাঁউরুটি, রঙ্‌ বেরঙের কেক। সবুজ পর্দা ঢাকা ছোট ছোট কেবিন। প্ল্যাস্‌টিকের বিচিত্র টেবিলক্লথের ওপর রেডিওর অনুকরণে অ্যাশ্‌ট্রে। ফুলদানি থেকে 'সুইট-পী'র একটা হাল্‌কা আতরের গন্ধ।

দুজনে মুখোমুখি। চা—স্যাণ্ড্‌উইচ্‌।

স্যাণ্ড্উইচের একটা কোনা দাঁতে কেটে রণজিৎ বললে, আপনার ওখানে একদিনও যাওয়া হল না।

টি-পটের নল থেকে উঠে আসা বাদামী ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য করতে করতে কিরণলেখা বললে, এলেই তো পারেন।

—বিনা-নিমন্ত্রণে যাব?—রণজিৎ হাসল।

তা বটে। এ-কথা আজকের রণজিৎ বলতে পারে—বলতে পারে অ্যাড্ভোকেট রণজিৎ। কিন্তু কয়েক বছর আগে কি এ-দাবিটা জোর করে করতে পারত সে? সেদিন একটুখানি প্রশ্রয়ের হাসিই ছিল যথেষ্ট, আজ সেখানে আগ বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ করতে হবে কিরণলেখাকে।

কিরণলেখা জবাব দিলনা—কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল মনের ভেতরে। একেবারেই কি সে ফুরিয়ে গেছে—সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে রণজিতের কাছে? তার কঠিন চোখ, তার পুরুষালী চেহারা, তার কাটাছাঁটা বৈষয়িক কথার ভঙ্গি—এরা সবাই মিলে কোনো প্রতিক্রিয়াই আর স্থষ্টি করে না রণজিতের মনে? এত শক্তি কি সত্যিই কোথাও ছিল তার?

—বেশ ভালোই আছেন আজকাল?—হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন এল রণজিতের কাছ থেকে।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কুঁজো ঘাড়টাকে সোজা করে বসল কিরণলেখা। ধারাল গলায় বললে, খারাপ থাকবার কী কারণ আছে বলুন?

আঘাতটা কি লাগল রণজিৎকে? বোঝা গেল না। একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধটা ঝাঁকালো একবার,—

—না এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—ও।

আবার চুপচাপ। টি-পটের নল দিয়ে রেশমী স্থতোর মতো

বাদামী রঙের ধোঁয়া। সুইট্‌-পীর গন্ধ। প্ল্যাস্টিকের টেবিল-ক্লথে বিচিত্র কারুকাজ। রাস্তায় মোটরের হর্ন।

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে তার সোনালী লেবেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রণজিৎ। তারপর: টাইগার হিল থেকে সান্‌-রাইজ দেখেছেন?

—না।

—যাবেন কাল?—রণজিৎ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনে।

এতক্ষণে নিজের মধ্যে একটা উত্তাপ অনুভব করল কিরণলেখা, এতক্ষণ পরে বুঝি চায়ের প্রতিক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। চশমার কাচের তলায় দেখা যাচ্ছে রণজিতের চোখ। ব্রীফ নয়—হাইকোর্ট নয়—এই মুহূর্তে কি নিজের হারিয়ে-যাওয়া ধূলিধূসর বেহালাটাকে মনে পড়ল রণজিতের?

—কাল কখন?—চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কিরণলেখা জানতে চাইল।

—অন্তত রাত চারটের মধ্যে বেরুতেই হবে। নইলে দেরি হয়ে যাবে পৌঁছুতে।

—অত রাতে?

রণজিৎ হাসল: ভয় করবে?

ভয়! আবার ছাড়িয়ে যেতে চাইছে রণজিৎ—আবার মাথাটা তুলতে চাইছে অনেক ওপরে। কিন্তু বাইরে এখন আর কুয়াশা নেই। হঠাৎ রোদ উঠেছে—তীব্র খরধার রোদ। এই রোদে মনে পড়ে কলকাতাকে। কলেজ স্ট্রীট্‌। ডবল-ডেকার। ইউনিভার্সিটি—লিফ্‌ট। পেছন থেকে বাংলা ডিপার্টমেন্টের কবি-কবি চেহারার হ্যাংলা ছেলেটার ছুড়ে-দেওয়া মন্তব্য। একটা ঘৃণার দৃষ্টি ফেলতেও অনুকম্পা হয়।

—বেশ, যাব।

রণজিৎ বললে, ধন্যবাদ। কদিন থেকেই প্ল্যান করছি, কিন্তু একা একা যেতে কিছুতেই উৎসাহ হয় না। তাহলে কাল ভোরেই আমি গাড়ি নিয়ে আসব লাডেন্ লা রোডে। হর্ন দেব। আপনি রেডি হয়ে থাকবেন।

—আচ্ছা।

কিন্তু ভবতোষের কথা কেউ তুলল না। রণজিৎ বলল না, মনে করিয়ে দিল না কিরণলেখা। রণজিতের সঙ্গে এই শক্তি-পরীক্ষায় কোথাও কোনো ভূমিকা নেই ভবতোষের। এমনকি, দর্শকেরও না। শুধু একবারের জন্যে কিরণলেখা ভাবল, ভবতোষের দাড়িগুলো বড় হয়ে গেছে—হয়তো একখানা ব্লেড্ দরকার ওর। আর দরকার একটিন সিগারেট, আজকের খবরের কাগজ।

কিরণলেখা বললে, চলুন—ওঠা যাক এবার। আর বেশি দেরি হলে বাজারে ভালো মাছ কিছুই পড়ে থাকবে না।

লেপ মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে ভবতোষ। ঘুমুচ্ছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। অথবা রাত্রের ঘুমটাকে দিন-রাত্রির একটা ক্লান্তিকর ঝিমুনির মধ্যে প্রসারিত করে নিয়েছে সে। একবার ইচ্ছে করল মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় একটুখানি। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুরে আসা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া হয়তো ভালো লাগবে না ভবতোষের।

চা করতে হবে। কিরণলেখা স্টোভ ধরাতে বসল।

পাশের ঘরে এক মারাঠী ভদ্রলোক আছেন—এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে লাফালাফি করছে সমানে। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মশলা-মেশানো রসুনের উগ্র গন্ধ—কী একটা ভালো জিনিস রান্না হচ্ছে ওখানে। মোটা-গলায় ধমক দিচ্ছেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। জানলার বাইরে একটু দূরের রাস্তায়

ভুটিয়া ঘোড়ায় চেপে চলেছে ছুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে। স্টোভে পাম্প করতে করতে একবার ভবতোষের দিকে তাকিয়ে দেখল কিরণলেখা। নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে আছে বিছানায়—কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দু হাতের শীর্ণ আঙুলগুলোকে!

ঘরটা খালি। বিশ্রী রকমের খালি। পাশের ঘরে মারাঠী বাচ্চাগুলোর চিৎকার। ভারী একা-একা লাগল কিরণলেখার। স্টোভে কেট্‌লি চাপিয়ে বিছানার পাশে বেতের চেয়ারটায় এসে বসল।

ভবতোষ চোখ মেলল। ঝিমুচ্ছিল? জেগেই ছিল? কে জানে!

কিরণলেখা আস্তে আস্তে বললে, তোমার সিগারেট এনেছি—আর ব্লেড্।

—আচ্ছা।

—আর এই আজকের খবরের কাগজ।

—দাও।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল ভবতোষ। কিন্তু পড়ার আগ্রহ দেখা গেল না। নিরাসক্ত শান্তিতে মেলে রাখল বুকের ওপর।

একবার কিরণলেখার মনে হল, কথাটা বলবে ভবতোষকে? বলবে, কাল শেষ রাত্রে রণজিতের সঙ্গে টাইগার হিলে যাওয়ার প্রোগ্রামের কথাটা? জিজ্ঞাসা করবে, তুমিও যাবে নাকি একবার? রাত-দিন তো ঘরেই শুয়ে থাকো, এমন করলে শরীর ভালো হবে কী করে? চলো না—ঘুরে আসবে একটু?

কিন্তু বলেই বা কী হবে? কিছুতেই জাগানো যাবে না ভবতোষকে। একটা অতল নির্বেদের মধ্যে সে নিঃশেষিত। সেখান থেকে কিছুতেই উঠে আসতে চাইবে না। এমন কি, কাল শেষ রাতে রণজিতের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কুৎসিত কল্পনার যে

সুযোগ আছে, তাই নিয়ে একবারও চঞ্চল হয়ে উঠবে না ভবতোষ। মনে মনেও না।

একবার হয়তো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবে—হয়তো তাও না। হয়তো লেপটাকে আরো বেশি করে মুখের ওপরে টেনে আনবে। জিজ্ঞাসাও করবে না, কোথায় যাচ্ছ, কখন ফিরবে, অথবা আদৌ আর ফিরবে কিনা !

একেই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন বলে ?

শক্ত পুরুষালি চেহারার কিরণলেখা শিউরে উঠল একেবারের জন্যে। ঘরটা খালি—বিশ্রী রকমের খালি। চার বছর পরে—বিয়ের চার বছর পরে এই প্রথম ভবতোষের উপস্থিতি অসহ্য লাগল তার কাছে।

পরক্ষণেই নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা —যেন মুক্ত করে নিলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে। চায়ের কেট্‌লিতে জলটা টগবগ করে ফুটছে।

পরদিন কিরণলেখার ঘুম ভাঙল ভোর চারটের আগেই।

চোখ মেলতেই দৃষ্টি পড়ল পাশের টি-পয়ের ওপর। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা ঝকঝক করছে ওখানে। কাচের আড়াল থেকে কতগুলো সবুজ অগ্নিবিন্দু হিংস্রভাবে জ্বলজ্বল করছে। রণজিতের আসতে পনেরো মিনিট দেরি আছে এখনো।

সহজ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়ছে ভবতোষের। হয়তো সেই বর্ণহীন ঘুমে তলিয়ে আছে সে : যেখানে আলো নেই, আকাশ নেই —কিরণলেখা নেই—কেউ নেই। শুধু ছায়ার মতো কতগুলো ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন আছে অথবা তাও নয়। যাই থাক—সেখানে কিরণলেখা নেই—না থাকলেও ক্ষতি নেই।

একবার রূঢ় একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ভবতোষকে—একটা অর্থহীন কান্নায় ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তার চাইতেও সহজ কাজ নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে যাওয়া। কিরণলেখা তাই করল।

ঘরের কোন্ জিনিসটা কোথায় আছে, তার নির্ভুল হিসেব জানে কিরণলেখা। খাট থেকে নেমে তিন পা বাঁ দিকে গেলে আল্না—হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে নীল রঙের শাড়িটা। তার পাশেই ঝুলছে ওভারকোট। রিস্ট্‌ওয়াচটা কোটের পকেটেই আছে। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটার পাশেই পড়ে আছে হাতব্যাগ। বর্ষাতি রয়েছে দরজার কাছেই। রাত্রে চুল বেঁধে শুয়েছে—তার জন্যেও কোনো ভাবনা নেই। কস্‌মেটিক সে ব্যবহার করে না—প্রশ্নই ওঠে না তার।

এখন শুধু অপেক্ষা করা—শুধু কান পেতে থাকা রণজিতের মোটরের হর্নের জন্যে। ভবতোষের ঘড়িতে সবুজ অগ্নিকণায় আরো পাঁচ মিনিট বাকী।

নিঃশব্দে দরজা খুলল কিরণলেখা। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতের মতো চোখে-মুখে এসে পড়ল। ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো যেন হা হা করে উঠল নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসিতে। শীতল-কালো আকাশ অসংখ্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে কিরণলেখার মুখের দিকে তাকাল।

তারপরেই চমকে উঠল সে।

কোথা থেকে তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝলক বয়ে এল একটা। পথের ও-পাশে দীর্ঘ পাইন গাছটার চূড়ো মর্মরিত হল—যেন একটা অতিলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠতে লাগল থরথরিয়ে। ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোতে শাঁ শাঁ করে কান্নার মতো শব্দ বাজল। আর কিরণলেখার মনে হল—ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রণজিতের দীর্ঘ দেহ

কিরকম ছায়া ফেলবে কে জানে। ওই রকম অলৌকিক—ওই রকম বিরাট্, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত আতঙ্কে তার মনে হবে ঃ এই মুহূর্তে একটা ছোট পাখির মত তাকে মুঠোয় করে তুলে নিতে পারে রণজিৎ—ছুড়ে ফেলে দিতে পারে কোনো অতলস্পর্শ খাদের ভেতরে, আর তারপর হো হো করে একটা প্রচণ্ড কৌতুকের হাসিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে রাত্রির অন্ধকারকে।

ভয়! এবার আর নিজের কাছে মন লুকোতে পারল না কিরণলেখা। ভয়। শীতল নিষ্ঠুর অন্ধকার—অসংখ্য নক্ষত্রের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি—পাইন গাছের চূড়োটার অলৌকিক দোলা, আর—আর—

কিরণলেখা ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এল। এক কোণে ছুড়ে দিলে ওভারকোটটা। তারপর পলাতক একটা খরগোশ যেমন করে তার গর্তের মধ্যে এসে লুকোয়—তেমনি করে ডুবে গেল লেপের ভেতরে।

আর আশ্চর্য, এরই জন্যে কি অপেক্ষা করছিল ভবতোষ? সে কি জানত, এমনি একটা কিছু ঘটবে? নইলে আজ দু বছর পাশে পাশে শুয়েও ঘুমের ঘোরে যে ভবতোষ কিরণলেখাকে স্পর্শ করেনি, সে কেন তাকে এমন করে জড়িয়ে নিলে বুকের মধ্যে?

বাইরের রাস্তায় একটা মোটর থামল। দুবার হর্ন বাজল। কিরণলেখা আরো বেশি করে সরে এলো ভবতোষের বুকের মধ্যে, ভবতোষের হাতটা আরো বেশি করে সাঁড়াশির মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপরে কতবার হর্ন বাজল, কতক্ষণ ধরে অধৈর্য প্রতীক্ষায় বাজতে বাজতে থেমে গেল, কিরণলেখা টেরও পেল না। সমস্ত

রাতে বিনিদ্র অস্বস্তির পরে এইবার প্রথম তার চোখ ভরে ঘুম নেমে এল।

কিরণলেখা জানত, রণজিৎ ক্ষমা করবে না। একবার যখন দাবি করতে শিখেছে, তখন সহজে সে-দাবি ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। পোস্ট্-গ্র্যাজুয়েটের নিরীহ নিস্তরঙ্গ রণজিতের মধ্যে একটা উগ্র-ক্ষুধার্ত জাগরণের পালা শুরু হয়েছে। আর সে বেহালা বাজায় না—হয়তো রিভলভারের লাইসেন্স নিয়েছে এখন।

দুদিন ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে গেল লাডেন্ লা রোড—ম্যাল্—দারোগা বাজারের রাস্তা। যে নেপালী কাঞ্ছাটা দুবেলা বাসন মাজে, ঘর-দুয়োর পরিষ্কার করে, বাজার করাল তাকে দিয়েই। আধখানা বুনে রাখা স্কার্ফটাকে টেনে খুলে ফেলল—তারপর সকাল-বিকেল বসে গেল সেইটেকে নতুন করে বুনতে।

কী ভাবল ভবতোষ? কিছু কি ভাবল? দাড়ি কামাল, পর পর কয়েকটা সিগারেট খেল, এমন কি নিজেই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনল খবরের কাগজ। রাত্রিতে কিরণলেখার ওই আত্ম-সমর্পণের মধ্যে কোনো অর্থ কি খুঁজে পেয়েছে ভবতোষ? নিজের ভেতরে কোথাও কি এতটুকু শক্তিকে আবিষ্কার করেছে সে?

দুটো দিন—দুটো তীক্ষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। কোথায় মিলিয়ে গেল কুয়াশা—কোথায় হারিয়ে গেল শীতার্ত বিষণ্ণতার কুহক। পাথর গরম হয়ে উঠল।—উদয়াস্ত ঝকঝক করতে লাগল কাঞ্চন-জঙ্ঘা, চারদিকের নানা রঙের বাড়ীগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে

রইল নিষ্ঠুর নগ্নতায়। এই আলোয়—এত প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল রণজিৎ। এই রোদে ঝকঝক করে ওঠে ইউনিভার্সিটির প্রকাণ্ড সাদা বাড়িটা—হেদুয়ার জল—কলেজ স্ট্রীট—কলকাতা। এ আলোয় রণজিতের কুঁকড়ে লুকিয়ে থাকার পালা। আর কিরণলেখার বসে বসে ভাবা ঃ এতখানি প্রশ্রয় কী করে সে দিয়েছিল রণজিৎকে—কেমন করে সে বলতে পেরেছিল ঃ আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত ?

রণজিৎ এল আরও দুদিন পরে।

এতটা দুঃসাহস কোথা থেকে এল রণজিতের—যে অসঙ্কোচে চলে আসতে পারল সেখানে—যেখানে ভবতোষ আছে ? কেমন করে সে দুম্‌দুম্‌ করে ঘা দিতে পারল দরজায়। যেন দরকার হলে ভেঙে ফেলবে ?

তার কারণ ছিল বৃষ্টি—অশ্রান্ত বৃষ্টি। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ আকাশ পোড়ো ছাইয়ের মতো রঙ ধরেছিল দিনের বেলা, রাত্রির অন্ধকারে তা আলকাতরার মতো কালো হয়ে উঠলো। সামনের পাইন গাছটায় আছড়ে পড়তে লাগলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক—শন্‌ শন্‌ করে আর্তনাদ করে চলল ইলেকট্রিকের তার। আর সেই সময় প্রচণ্ডভাবে দরজায় ঘা দিলে রণজিৎ।

হাতের বোনাটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা—যেন ভূত দেখল। বিছানার ওপরে উঠে বসল ভবতোষ। রণজিতের ওয়াটারপ্রুফ থেকে স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটের ওপর, বৃষ্টিতে চক্‌চক্‌ করছে পায়ের কালো গাম বুট। ওয়াটারপ্রুফটাকে এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে শব্দ করে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। আজ বিনা নিমন্ত্রণেই সে এসেছে।

তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বললে,—অনেকদিন পরে দেখা হল ভবতোষ, ভালো আছো তো ?

কী একটা বলতে চাইল ভবতোষ—বলতে পারল না। শুধু দুটো কোটরে বসা চোখের ভেতর থেকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রণজিতের দিকে। সে দৃষ্টিকে রণজিৎ গ্রাহ্যও করল না।

কিরণলেখা দেখল, বাঘের মতো দপদপিয়ে উঠেছে রণজিতের চোখ।

রণজিৎ বললে, সেদিন কথা দিয়েও কেন গেলেন না আপনি? প্রায় আধঘণ্টা ধরে মোটরের হর্ন বাজিয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বাইরে বৃষ্টির একটানা শব্দ—ইলেকট্রিক তারের গুঞ্জন—পাইন গাছটার আর্তনাদ। কী ভয়ঙ্কর—কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে রণজিৎ! এই দুর্যোগের পটভূমিতে যেন হিংস্র একটা বন্য শক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে সে। কে জানে তার ওভারকোটের পকেটে একটা রিভলভারও আছে কিনা!

হয়তো হাঁটু ভেঙে বসে পড়ত কিরণলেখা—হয়তো বলেও বসত ঃ ক্ষমা করো আমাকে, এমন অপরাধ আমি আর করব না। —হয়তো রণজিৎ যদি তখন তার হাত ধরে এই ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত, এক বিন্দু প্রতিবাদের শক্তি থাকত না কিরণলেখার।

কিন্তু সেই মুহূর্তে—বৃষ্টি আর হাওয়ার সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর গুরু গুরু শব্দ উঠল একটা। সে শব্দ আকাশে নয়—মাটিতে। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো দুলে উঠল ঘরটা।

খাটের থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ভবতোষ। ধস নামছে!

আবার সেই গুরু গুরু ধ্বনিটা কানে এল। আরো তীব্র —আরো ভয়াল। দপ করে নিভে গেল ঘরের ইলেকট্রিকের আলোটা। মেজেটা দুলতে লাগল, পাশের মারাঠী পরিবারের

থেকে শোনা গেল আকুল কান্নার শব্দ। মড়মড় করে পাইন গাছটা ভেঙে পড়ল—ঘরের পিছন দিকটা হঠাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে টুকরো টুকরো কাঠের মত ঢালু বেয়ে গড়িয়ে চলল।

একটা পৈশাচিক আর্তনাদ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল রণজিৎ—কিন্তু বেশী দূর যেতে পারল না। সামনে পিছনে দুদিকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পথের রেখা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অতল অন্ধকারে দূরে-কাছে ক্রমাগত ধস ভাঙতে লাগল। মানুষের চিৎকার—বুক-ফাটা কান্না—মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি—সব একসঙ্গে মিলে একটা বীভৎস নরকের মধ্যে পৌঁছে দিলে রণজিৎকে।

রণজিৎ দাঁড়াতে পারল না। হাঁটুতে এক বিন্দু শক্তি কোথাও অবশিষ্ট নেই। চোখ বুজে বসে পড়ল পথের ওপর। এই দ্বীপের মতো জায়গাটুকু যে কোনো সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ—

ততক্ষণ বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কিরণলেখার আর্তনাদ তার কানে এসে ঘা দিতে লাগল: আমাকে তোলো, আমাকে তোলো এখান থেকে। আমি এখনো বেঁচে আছি—

উঠে দাঁড়াতে চাইল রণজিৎ—সাধ্য কী! সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে তার। অসহ্য বিষাক্ত যন্ত্রণায় সে কান পেতে শুনতে লাগল কিরণলেখার আকূতি: ওগো কোথায় তুমি! আমি যে এখনো বেঁচে আছি—

চোখ দুটো বোজবার আগে দেখতে পেল রণজিৎ—অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেল! কিরণলেখার কাছে যার কথা শুনেছিল—একটা শবদেহের মতো যাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল বিছানায়, সেই ভবতোষ একটা প্রচণ্ড দানবের মতো ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে প্রাণপণে। এত শক্তি, এমন অমানুষিক শক্তি কোথায়

পেল ভবতোষ? কী করে এমন ভয়ঙ্করভাবে বেঁচে উঠল সে, যে কিরণলেখাকে সে বাঁচিয়ে তুলবেই?

একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো রণজিৎ অনুভব করল, অনেক বর্ষা—অনেক শরৎ, অনেক সূর্যের আলো আর অনেক অন্ধকার তিলে তিলে এই শক্তি দিয়েছে ভবতোষকে। একটা আকস্মিক আবেগ নয়—একটা উন্মত্ততা নয়, এ শক্তির মধ্যে অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। তার মৃত্যু হয়নি—শুধু আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। জড়তা ছিল কঠিন—তাই তার আবরণ ভাঙবার জন্যে প্রয়োজন হল এমন ভয়াবহ চরম মুহূর্তের।

—আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও তুমি—

উন্মত্ত দানবীয় শক্তিতে কাঠ সরাচ্ছে ভবতোষ। দাম্পত্য জীবনের যে প্রেম তিলে তিলে সংগ্রহ করেছে সূর্য আর নক্ষত্রের অগ্নিকণা—তাই এখন বজ্রপ্রদীপ হয়ে জ্বলছে ভবতোষের রক্তে। কিরণলেখাকে সে-ই বাঁচাবে, সে-ই শুধু বাঁচাতে পারে। সীমাহীন দীনতায় হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে রণজিৎ নিশ্চেতনার গভীরে তলিয়ে গেল॥

কল্প-পুরুষ

আলো নিভিয়ে দিলেও ঘর অন্ধকার হয় না—এই এক দোষ কলকাতার। এমন একটা শান্ত তিমির কোথাও নেই—যেখানে নিজের চারদিকটাকে মুছে দিয়ে ডুবে যাওয়া যায় আকাশের সমুদ্রে! পার্কের এক কোনায় গিয়ে বসলে শোনা যাবে পেন্‌শন-পাওয়া বড়বাবুদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা; গড়ের মাঠের এক প্রান্তে গিয়ে বসলেও কানে আসবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টাকার হিসেব করছে কেউ—অথবা ব্যাখ্যা করছে ক্রিকেট ম্যাচের। চীনে-বাদামের খোলা ভাঙবার আওয়াজে মুখর হয়ে থাকবে গঙ্গার ধার—মনে হবে সারা পৃথিবীতে রাশি রাশি দাঁত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই আর।

নির্জনতা কোথাও নেই—নেই অন্ধকার। এমন একটা বিবর নেই—যেখানে আহত জন্তু লেহন করতে পারে নিজের ক্ষতকে। আলো আর শব্দ, শব্দ আর আলো—সব সময়ে খুঁজে ফিরছে শিকারীর মতো। সামনের রাস্তা থেকে বল্লমের ফলার মতো আলো এসে পড়েছে ঘরে—ওধারের বাড়িটার তেতলার ঘরে একটা একশো পাওয়ারের আলো জ্বেলেছে কেউ,—যতবার দৃষ্টি যাচ্ছে, ততবারই মনে হচ্ছে এক এক মুঠো করকরে বালি এসে পড়ছে চোখের ভেতরে।

শুয়েছিল, উঠে বসল শিবেন। আবার কি ব্ল্যাক-আউট আসতে পারে না কলকাতায়, ফিরে আসতে পারে না যুদ্ধের যুগের সেই

তিমিরান্ধ দুঃস্বপ্ন? অথবা এখান থেকে একটা ভারী পাথর ছুড়ে দিয়ে ভেঙে চুরমার করা যায় না ওই একশো পাওয়ারের বাল্‌বটা?

কিন্তু মনের ভেতর? সেখানে কী করে টেনে আনা যাবে কালো অন্ধকার? বাইরের সমস্ত আলো মুছে গেলেও বুকের মধ্যে কী করে আসবে একটা শীতল মৃত রাত্রি? সায়নাইড্? ছিঃ ছিঃ। অত কাপুরুষ নয় শিবেন।

শিবেন কাপুরুষ নয়। তবু আলো-নেভানো ঘরের দরজাটা হুড়মুড় করে খুলে যেতেই সে থরথর করে কেঁপে উঠল, দু' তিনটে গলায় সমস্বরে চিৎকার উঠল, চলো শিবেন, চলো। এক সেকেণ্ড দেরি নয় আর।

—কোথায় যেতে হবে?—নির্বোধ অভিভূত প্রশ্ন এল শিবেনের।

একজন এগিয়ে গিয়ে টেনে দিলে ঘরের সুইচটা। একরাশ নগ্ন হিংস্র আলো নিঃশব্দে হেসে উঠল হা হা করে। শিবেন দু' হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

—আজকের দিনে এমন করে আলো নিবিয়ে বসে থাকতে হয়? গাধা কোথাকার!—আর একজনের গলায় ধিক্কার শোনা গেল: চট্ করে ভালো জামা কাপড় যা আছে পরে নে। এক্ষুনি তোকে যেতে হবে অমিতাকে বিয়ে করতে।

—অমিতাকে বিয়ে করতে! আমাকে!—যেন অনেক দূর থেকে কথা কইল শিবেন।

—হ্যাঁ, তোকেই বই কি। রাত দশটায় শেষ লগ্ন। এক্ষুণি বেরোতে হবে।—আর একজন তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে: এখন আটটা।—যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমরা বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছি।—সজোরে শিবেনের পিঠে একটা থাবড়া মারল সে, হেসে বললে, জীবনটা শুধু নাটক নয়রে মূর্খ, কখনো কখনো মেলোড্রামাও হয়ে ওঠে।

তক্তপোষ থেকে প্রায় জোর করে টেনেই তুলল শিবেনকে। নীচে থেকে বার দুই ট্যাক্সির অধৈর্য হর্ন শোনা গেল—যে বসে আছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। এখান থেকে একেবারে যাদবপুরে যেতে হবে—অনেকখানি রাস্তা।

ঠন্‌ঠনিয়া থেকে যাদবপুর। অনেকখানি রাস্তা বইকি। অনেকটা সময় লাগবে। ট্যাক্সি চলতে থাকুক। সেই ফাঁকে, ওরা বিয়ে বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত, দিন কয়েক পেছনে ফেরা যাক। শোনা যাক একটা পুরোনো গল্প।

অমিতার বাবা শৈলেশ রায়—যিনি পোর্ট কমিশনারে একটা ভালো গোছের চাকরি করেন এবং হালে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কাঠা তিনেক জমি কিনে কর্পোরেশনে বাড়ির প্ল্যান পাঠিয়েছেন—তিনি শিবেনের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। শিবেন যখন চাকরিটা পাব-পাব করছে অথচ আজ-কাল করে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় মাস তিনেকের জন্যে শিবেনকে থাকতে হয়েছিল অমিতাদের বাড়িতে।

বাংলা দেশে যে ধরণের ছেলেকে 'বেশ ব্রাইট' বলা যায়—শিবেন সেই দলের। শ্যামবর্ণের লম্বা চেহারা, অথচ হাঁটবার সময় কুঁজো হয়ে পড়ে না পিঠটা ; স্যুট্‌ পরলে ঝকঝকে দেখায়, শার্টের কলার তুলে দিয়ে ধুতির সঙ্গে কাব্‌লী চটি পরলে মনে হয় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ধারালো ছাত্র। বিদেশী সাহিত্য আর বিদেশী ফিল্‌মের কিছু খবর রাখে, কিছু গানের গলা আছে, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা সম্পূর্ণ কবিতা ভদ্র উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারে, সভার শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাতে পারে বেশ স্পষ্ট নির্ভীক ভঙ্গিতে।

আর অমিতা তখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে।

শিবেন তাকে কয়েকটা ইংরেজী কবিতা বুঝিয়ে দিলে, গোটাকয়েক গানের সুর ঠিক করে দিলে এবং অমিতার চোখের সামনেই একটা বখাটে ছেলেকে থাবড়া বসিয়ে দিলে ঘা কতক। কিশোরী অমিতার প্রথম মেলা দৃষ্টির সামনে পুরুষোত্তম হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে শিবেন।

তারপর চাকরি নিয়ে যেদিন সে মেসে চলে এল সেদিন সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল অমিতা। অসুখের ভান করে কলেজে কামাই দিয়েছিল একদিন। আর শিবেনকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, সপ্তাহে অন্তত একদিন করেও এ বাড়িতে সে আসবে।

প্রায় একবছর ধরে সে প্রতিজ্ঞা নিয়মিত পালন করে এসেছে শিবেন। আই এস-সি পরীক্ষার পরে অমিতা যখন এলাহাবাদে মামার বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছে আর শিবেন চিন্তা করছে একটা রবিবারের সঙ্গে দু'দিন ছুটি যোগ করে নেওয়া সম্ভব কিনা—ঠিক সেই সময় বোমা ফাটালেন শৈলেশ।

সে বোমা দেরাদুনের দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের মতো ছেলে নাকি আর হয় না। এম এস-সি পাশ করে ফরেস্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে সে—কিছুদিনের ভেতরেই বাইরে যাওয়ার স্কলারশিপ পাবে একটা। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা—টেনিস্ খেলায় নাম ছিল কলেজে পড়বার সময়। মা নেই—বাবা রিটায়ার করে মুসোরিতে থাকেন। নির্ঝঞ্ঝাট সুন্দর সংসার।

বলতে বলতে আবেগে প্রায় গলা ধরে এল শৈলেশের : এ তো পাত্র নয়—যেন আকাশের চাঁদ। অমিতার কপালে এমন ভালো ছেলে জুটবে এ আমি কল্পনাও করতে পরিনি।

শুনে অমিতার মা ফোঁস করে উঠেছিলেন : অতই বা বলছ

কেন? আমার মেয়েই কি ফেলবার নাকি? দেখতে সুন্দরী—লেখাপড়া শিখছে—

শৈলেশ বাধা দিয়েছিলেন: আহা হা, ওটুকু লেখাপড়া আজকাল সব মেয়েই শেখে। মেয়ে আমার সুন্দরী—তা বলতে পারো বটে। কিন্তু অমন ভালো ছেলে, তার জন্যে কি আর রূপসী মেয়ের অভাব হত?

তর্কের জন্যেই তর্ক তুললেও কথাটা মেনে নিতে হয়েছিল মমতাকে।

—তা কী করে এল এই সম্বন্ধ?

—দীপঙ্করের কাকা মথুরেশ বাবু আমাদের অফিসেই চাকরি করেন যে—গলাটা নামিয়ে এনেছিলেন শৈলেশ বাবু। যেন কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন, এমনিভাবে চুপি চুপি বলেছিলেন: দীপু—মানে দীপঙ্করের বাবা তাঁরই হাতে সব ভার দিয়েছেন। আর মথুরেশের ভারী পছন্দ হয়েছে অমিতাকে।

—মেয়েকে তিনি দেখলেন কী করে?

—গত রবিবারে যখন অমিতাকে 'জু'তে নিয়ে যাই—তখনই মথুরেশের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় সেদিনই একটু আভাস দিয়েছিলেন, আমি ভালো বুঝতে পারিনি। আজ খুলেই বললেন।

—ছেলে নিজে একবার দেখতে আসবে না?

—না-না, সে-ধরনেরই নয় সে। বাবা কাকা যা বলবেন, মাথা নিচু করে তাই শুনবে।

—এ সবই ভালো কথা—মমতার মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছিল এবার: কিন্তু দেনাপাওনা? সেইটেই তো আসল। হাতী কেনবার তো শক্তি নেই আমাদের।

শৈলেশের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠেছিল আনন্দে: না, সেখানেও কোনো চাপ নেই ওদের।

দীপুর বাবা ওসব জিনিসের ঘোর বিরোধী—সাহেবী ধাঁচের মানুষ কিনা আমরা খুশি -ওঁদের দাবি- নেই কিছু

এ সৌভাগ্য লটারিতে রাতারাতি লাখ টাকা পাওয়ার মতো। অথবা তার চাইতেও বেশী। যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং দেবদূত নেমে এসেছে অমিতাকে তুলে নিতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম নিয়ে বসে গিয়েছিলেন হিসেব করতে।

শৈলেশ বলেছিলেন, দেরি করা ওঁদের ইচ্ছে নয়। সম্ভব হলে বৈশাখেই। হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যেই বিলেতে রওনা হবে দীপু। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

—অমিকে বিলেতে নিয়ে যাবে?—ভাট-পাড়ার পণ্ডিত বংশের মেয়ে মমতার চোখে পলক পড়েনি অনেকক্ষণ ঃ বলো কি!

কিন্তু এত বড় সুখবরে খুশী হয়নি অমিতা। ছুটে পালিয়ে এসেছে ছাদে। নিজের মনে কেঁদেছে আধঘণ্টা ধরে। ছাদের কার্নিশের কাছে গিয়ে ভেবেছে আত্মহত্যার কথা, তারপর পাশের বাড়ীর গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের ওপর একটা কালো বেড়ালের জ্বল-জ্বলে চোখ দেখে পালিয়ে এসেছে নীচে।

প্রতিবাদ অবশ্য জানালো সে পরের দিন। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে।

—আমি এখন বিয়ে করব না মা।

প্রথমটায় আমল দিলেন না মা। সেলাইয়ের কলে নিবিষ্ট মনে সুতো পরাতে পরাতে বললেন, কী করবি তবে?

—আরো পড়ব। বি এস-সি, এম এস-সি।

—কী হবে তাতে?—মমতা চোখ তুললেন এবার। কড়া পাওয়ারের চশমার নীচে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল চোখের পাতা দুটো।

—কী হবে?—অগাধ বিস্ময়ে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে

রইল অমিতা। গঙ্গার স্তব আর মহিম্ন স্তোত্র যার কণ্ঠস্থ, এ-যুগে এরকম প্রশ্ন করা সেই মা-র পক্ষেই সম্ভব!

—লেখাপড়া শিখে নিজের পায় দাঁড়াব!

এলোমেলোভাবে অমিতা জবাব দিতে চেষ্টা করল একটা।

—নিজের পায়ে দাঁড়াবার কষ্ট আর তোমায় করতে হবে না। আমরা বিয়ে দেব তোমার।

—মা!

মমতা রূঢ় গলায় বললেন, আজকাল ওই এক বুলি ফুটেছে তোমাদের। যে-সব মেয়ের ঘর-বর জোটে না তারাই আই-এ বি-এ পাশ করে, আর ও-সমস্ত কথা আওড়ায়। পাকামি কোরো না—তোমার যাতে ভালো হয় তাই আমরা করব।

এর ওপরে তর্ক চলে না। ব্যর্থ ক্রোধে দুম্ দুম্ করে চলে এল নিজের ঘরে। তারপর চিঠি লিখল শিবেনকে।

ঃ শিগ্‌গির এসো তুমি। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ভীষণ ব্যাপার।

মাত্র তিনটি লাইন। এবং ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগল না শিবেনের। সমস্ত পৃথিবীর রঙ্ বিবর্ণ হয়ে গেল—কোথা থেকে যেন একটা হ্যাঁচকা টান লাগল হৃৎপিণ্ডে।

শিবেন আসতে একটা কবিতা বোঝাবার অছিলায় অমিতা তাকে ডেকে নিয়ে গেল পড়ার ঘরে। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলে বললে, আমায় বাঁচাও।

খবরটা অবশ্য বাড়িতে পা দিতেই পেয়েছিল শিবেন। শৈলেশ জিনিষটাকে আপাতত যথাসম্ভব চেপে রাখতেই বলেছিলেন, কিন্তু আত্মীয় শিবেনের কাছে মনের আনন্দ মমতা লুকিয়ে রাখতে পারেননি। হয়তো ইচ্ছে করেই ঘরের সে-দিকটাতেই চেয়ার টেনে

নিয়ে বসেছিল শিবেন—যেদিকে আলোটা কম, যেখানে তার বিবর্ণ কালো মুখটা ভালো করে দেখা যায় না, যেখানে তার চোখের বোবা যন্ত্রণা অনেকখানি আবছা হয়ে থাকে।

তখনি হয়তো তার ছুটে পালানো উচিত ছিল শৈলেশের বাড়ি থেকে। কিন্তু যন্ত্রণা পাওয়ারও যে একটা বিষাক্ত নেশা আছে, সেই নেশার টানেই নির্জীব পায়ে সে অমিতার পড়ার ঘরে উঠে এসেছিল।

অমিতার কান্না কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেখবার পর শিবেন বললে, কী করব?

– আমি কী জানি? তুমি উপায় করো।

—উপায়?—একটা পেন্‌সিল-কাটা ছুরির হল্‌দে বাঁটটাকে একমনে লক্ষ্য করতে লাগল শিবেন।

—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। হতেই পারে না।

—কী করা যায়?—ছুরির বাঁটটার দিকে চোখ রেখেই শিবেন আওড়ালো। গলার আওয়াজে এমন একটা ক্লীব কাতরতা ফুটে বার হলো যে এত দুঃখের ভেতরেও একটা চাপা বিরক্তি বোধ হল অমিতার।

—বাবাকে বলো।—অমিতা আঁচলে চোখ মুছে ফেলল।

—রাজী হবেন কেন? প্রাণপণে একটা মর্মান্তিক হাসি হাসল শিবেন। নিজের গায়ে একটার পর একটা ছুরির আঁচড় টেনে যাওয়ার মতো বলে চলল, দীপঙ্করের পাশে আমি কে? তার বিদ্যে বেশী, চাকরি বড়, অবস্থা ভালো, দুদিন পরে বিলেত থেকে ফিরে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে বসবে সে। আর আমার—

অমিতা তীব্র হয়ে উঠল: থামো—থামো। যার খুশি সে কেষ্ট-বিষ্টু হোক, আমার কী? আমি তোমাকে ছাড়া আর

কাউকে বিয়ে করব না। বাবা যদি মত না দেন, চলো আমরা পালিয়ে যাই—

পালিয়ে যাওয়া! সারা শরীরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগল শিবেনের—মাথার ভেতরে ছলকে পড়ল এক ঝলক রক্ত। অতখানি? আইন অনুসারে এখনো পুরো সাবালিকা হয়েছে কিনা অমিতা, তাই বা কে জানে! সামনে পুলিশ কেসের সম্ভাবনা। তা ছাড়া চাকরিতে মাত্র মাস আটেক হয়েছে, এখনো 'প্রোবেশন' চলছে। চাকরিটা পাওয়ার ব্যাপারে শৈলেশের হাত যতখানি কাজ করেছিল, যাওয়ার ব্যাপারে তার চাইতে বেশীই কাজ করবে হয়তো। আর এ-বাজারে একটা চাকরি গেলে—

ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল শিবেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও চুলের গোড়াগুলো ভিজে উঠতে লাগল তার।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে মা-র ডাক শোনা গেল: অমি, এক কাপ চা করে দিলিনা শিবেনকে?

—যাচ্ছি—চোখের ওপর আর একবার আঁচলটা বুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অমিতা, আর এতক্ষণে যেন চাপা একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল শিবেনের। সময় চাই তার। কোনো একটা নিভৃতিতে—কোনো একটা নিঃসঙ্গ অন্ধকারের ভেতরে। যেখানে সে-ছাড়া আর কেউ নেই, এমনকি অমিতাও না। সেই একান্ত অবকাশে নিজের সত্তাটাকে সে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখবে: দেখবে তার প্রতিটি স্নায়ু-পেশী-মর্মগ্রন্থিকে।

সময় চাই তার।

কিন্তু অদৃশ্য মেঘনাদ দীপঙ্কর এর মধ্যে বাণে বাণে ছেয়ে ফেলছে আকাশ। ছিমছাম পোষাকের সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় মথুরেশবাবু একদিন এসে গানও শুনে গেলেন অমিতার।

আপত্তি করেছিল বইকি অমিতা। কেলেঙ্কারি না ঘটিয়ে

যতখানি করা সম্ভব। কিন্তু স্নেহশীল ভালোমানুষ বাবার মুখের দিকে তাকালে কেমন মায়া হয় যেন। তা ছাড়া কড়া পাওয়ারের শিখার নীচে মায়ের কঠিন চোখ। হিংস্র অবাধ্য মনটা কুঁকড়ে যায় তার সামনে।

ওদিকে সময় নিচ্ছে শিবেন। বন্ধ করেছে সিনেমায় যাওয়া। নতুন যে বইটা পড়বার জন্যে এনেছিল, ফ্ল্যাপের পরে তা আর বেশী দূর এগোয়নি। নিজেকে ভোলবার জন্যেই জোর করে দু'দিন বসেছিল ফ্ল্যাশ বোর্ডে—লাভের মধ্যে গুণতে হয়েছে মোটা রকমের হারের কড়ি।

আবার চিঠি এল অমিতার।

'তুমি করছ কী? শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি ওই দীপঙ্করের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে?'

কিন্তু ওবাড়িতে আর যাওয়া সম্ভব নয় শিবেনের পক্ষে। একটা জ্বলন্ত জতুগৃহের মতো ওই বাড়ি। ওর প্রত্যেকটা দেওয়াল থেকে অসহ্য উত্তাপ ঠিকরে আসে—জানলা-দরজার প্রত্যেকখানা কাচ জ্বলতে থাকে আগুনের শিখার মতো। মানুষগুলোকে মনে হয় আগুনের পুতুল, এমনকি অমিতাকেও। তবু দূরে থেকেও দহন থামে না। এক একবার অসহ্য হয়ে শিবেন ভাবে—পালিয়েই যাবে অমিতাকে নিয়ে। কিন্তু একটার পর একটা কিন্তুর শেকল পাক দিয়ে বাঁধতে থাকে তাকে।

দুপুর বেলা অসময়ে অফিস থেকে ফিরলেন শৈলেশ। অত্যন্ত উত্তেজিত।

—কী হল?—ভয় পেয়ে জানতে চাইলেন মমতা।

—একটা সাংঘাতিক কথা আছে। ঘরে এসো।

ধড়াস করে দরজা বন্ধ করলেন শৈলেশ, বুক পকেট থেকে বের করলেন চিঠি একখানা। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ো।

মমতা পড়লেন। এলোমেলো কাঁচা অক্ষরের চিঠি। কেউ বাঁ হাত দিয়ে লিখলে যেমন হয়। তবে বক্তব্যটা বুঝতে অসুবিধে হল না বিশেষ।

অমিতার বিয়েতে আপত্তি নেই। তবে শিবেন ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। কারণ শিবেনকে সে ভালোবাসে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোথাও বিয়ে দিলে আত্মহত্যা করবে সে।

শৈলেশ সভয়ে বললেন, এখন ?

—এখন আবার কী ?—মমতা ভয়ঙ্কর চোখে একবার তাকালেন স্বামীর দিকে, তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগলেন চিঠিখানা ঃ আমি আন্দাজ করেছিলাম আগেই।

আর্ত হয়ে উঠলেন শৈলেন ঃ তা হলে কি শিবেনের সঙ্গেই—

—ক্ষেপেছ তুমি ! আকাশের চাঁদ ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দেবে এই বাক্যিসর্বস্ব ছেলেটার সঙ্গে ?—মমতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ঃ ওই শিবেনকে বাড়ীর ত্রি-সীমানায় আর আসতে দেব না আমি।

—কিন্তু অমি যে ওকে ভালোবাসে !—অসহায়ভাবে শৈলেন বললেন, জোর করে বিয়ে দিতে গিয়ে শেষকালে যদি কিছু একটা—

জানালা দিয়ে চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে মমতা বললেন, কিছু হবে না। তোমার আদরেই এতখানি এঁচোড়ে পেকেছে মেয়েটা। সতেরো বছর বয়েস—এখনো কাঁচা মাটির মতো মন। বিয়ে দিয়ে দাও। অমন হীরের টুকরো ছেলে—একমাস যেতে না যেতে শিবেনের চিহ্নও কোথায় থাকবে না।

—অমিতাকে ডেকে একবার—

—কিছু দরকার নেই।—মমতা উঠে পড়লেন। তুমি মথুরেশ-বাবুকে বলো পাকা দেখার ব্যবস্থা করুন ওরা।

—শৈলেশ শেষবার একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন: যদি আত্মহত্যা—

—করতে হলে তুমিই করবে—মমতার স্বরে ইস্পাতের ঝলক: অমন আহ্লাদে শৌখিন মেয়ের অতখানি মনের জোর থাকে না।

কথাটা সম্পূর্ণ মানলেন না শৈলেশ, কিন্তু হার মানলেন। আর সত্যিই তো—সতেরো বছরের মন। একতাল কাঁচা মাটির মন। নতুন হাতের ছোঁয়া লাগলেই আবার নতুন হয়ে উঠবে সে। তা ছাড়া শিবেন। দীপঙ্কর যদি না আসত, তা হলে একবার ভাবা যেত প্রস্তাবটা। কিন্তু এখন। এখন আর সে প্রশ্নই ওঠে না।

এরই দিন দশেক পরে শিবেনের সঙ্গে অমিতার দেখা হল পার্কে। বাড়িতে দেখাশুনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। অমিতার চোখে এবার আর জল নেই—জ্বলন্ত ক্রোধ।

—কী করছ তুমি?

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে তিনটে কাঠি নষ্ট হল শিবেনের।

—ভাবছি।

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেলে তারপরে কি তোমার ভাবনার শেষ হবে?

শিবেন অমিতার দিকে তাকাতে পারল না, তাকালো হাতের সিগারেটটার দিকে। এত কষ্ট করে ধরাবার পরেও আবার নিবে গেছে সেটা।

—হবেই একটা কিছু।

—ছাই হবে।—অমিতার চোখ ঝকঝক করতে লাগল: কাল আমাকে আশীর্বাদ করতে আসবে—জানো?

শিবেন একটা ঢোঁক গিলল। কেমন আঠা আঠা লাগছে গলার ভেতরে।

অমিতা ঝুপ করে বসে পড়ল পাশের মরা ঘাসগুলোর ওপরে।

একটা শুকনো শালপাতা কুড়িয়ে নিয়ে টুকরো করতে লাগল দুহাতে।

—দীপঙ্কর! অমন ছেলে আর হয় না!—প্যারডির ভঙ্গিতে বলে চলল: এম এস-সি পাশ—বড় চাকরি করেন! অমন অনেক আছে। চেহারা সুন্দর? দুনিয়ায় মাকালের অভাব নেই। ভালো টেনিস খেলোয়াড়? আমি তো টেনিস র‍্যাকেট নই! আজ আবার শুনলাম নাকি বেহালা বাজায়। বেহালা তো যাত্রার দলের লোকেও বাজাতে পারে! কী বলো তুমি?

কী বলবে শিবেন? দীপঙ্কর কাছে নেই—বহুদূরের দেরাদুন থেকে একটার পর একটা শব্দভেদী বাণ ছুড়ছে। যদি সে কলকাতায় থাকত, থাকত দৃষ্টির সামনে—তাহলে তার অন্তত একটা বৃত্তরেখা দেখতে পেত শিবেন, একটা রন্ধ্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা করত তার ভেতরে। কিন্তু মাঝখানে এই বিরাট ব্যবধানটাকে ছড়িয়ে দিয়ে যেন অলৌকিক আর অসীম হয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এখন সে একটা ভাবমূর্তি! হাজার সুপুরুষ হলেও তার সামনের গোটা দুই দাঁত অতিরিক্ত উঁচু কিনা সে-কথা বলবার উপায় নেই, তার বেহালা কখনো কখনো বেসুরে বাজে কিনা তা-ই বা কে বলবে, এম এস-সিতে সে থার্ড ক্লাশ পেয়েছিল কিনা—কোন্ ক্যালেণ্ডার মন্থন করেই বা আবিষ্কার করা যাবে সে-কথা! দীপঙ্কর অবাস্তব—দীপঙ্কর অতিলৌকিক। বাস্তব দীপঙ্করের সঙ্গে তবু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু এই মেঘনাদের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে কী করে?

জোর করে শিবেন হাসতে চেষ্টা করল: আমার চাইতে অনেক যোগ্য লোককেই তো পাচ্ছ তুমি। মেনে নাও ওকে।

—মেনে নেব ওকে?—ছিটকে উঠে পড়ল অমিতা: একথা তুমিও বললে? বেশ, তুমি কিছু করতে না পারো—আমিই করব।

পার্কে থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না অমিতা ট্রামে উঠল, ততক্ষণ হতাশ দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে রইল শিবেন। তারপর ট্রামটা অদৃশ্য হয়ে গেলে মুখপোড়া সিগারেটটা আবার ধরাতে গিয়ে দেখল একটাও কাঠি নেই দেশলাইয়ে।

কিন্তু কী করবার শক্তি আছে অমিতার? চাপা আক্রোশে এক-একদিন ভালো করে না খেয়েই উঠে-যাওয়া, রাতের পর রাত বিনিদ্র বিছানায় ছটফট করা, শিবেনকে একটার পর একটা চিঠি লেখা, আর তারপরেই শিবেনের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়ে চিঠিগুলোকে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

শৈলেশ লক্ষ্য করলেন না, কিন্তু মমতা? তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না নিশ্চয়ই। তবু আশ্চর্য নিরাসক্তি মমতার। তাঁর কড়া পাওয়ারের চশমার নীচে চোখের দৃষ্টি একবারও কোমল হয়ে ওঠে না, একবারও প্রশ্ন করেন না তিনি: ভালো করে খেলিনে কেন অমি? শরীর কি ভালো নেই?—দুই আর দুইয়ের চিরন্তন যোগফলের মতই ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মেয়ে ধ্রুব জানেন, সতেরো বছরের মেয়ের মনের কাছে শিবেন একটা ভেঙে-যাওয়া রঙিন খেলনা। তার জন্যে শোকের পরমায়ু দু দিনের বেশী নয়।

আবার দেখা হল পার্কে।

—এখনো কিছু করছ না?

শিবেনের আজকাল কেমন ভয় করে অমিতাকে। কেমন মনে হয়, অমিতা কোথাও তাকে স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না—বারে বারে আলোড়ন তুলে কেমন ঘোলাটে করে দিচ্ছে সব। অন্তত একটা দূরত্ব দিক কয়েক দিনের জন্যে: কিছু অবকাশ: যেখানে শিবেন প্রস্তুত করে নিতে পারে নিজেকে।

তবু অমিতার টানে না এসে উপায় নেই। যেন বুকের শিরাগুলোকে ধরে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করে সে।

—ভাবছি।—পড়া-না-পারা ছাত্রের গলায় জবাব দিলে শিবেন।

—আশীর্বাদ করে গেছে। করুক!—উদ্ধত বিদ্রোহে অমিতা বলে চলল: বিয়ে আমি কিছুতেই করব না। বিয়ের আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। তুমি আমাকে না নিয়ে যাও—চলে যাব যেদিকে খুশি।

—কিন্তু অমিতা—কিছু বলবার নেই, তবু অমিতার মুখের কথাগুলিকে এগিয়ে দেবার জন্যেই ওটুকু জুড়ে দিলে শিবেন।

—কিন্তু কিসের আবার? তুমি ভয় পেতে পারো, আমার কোনো ভয় নেই। দীপঙ্কর!—সুন্দর মুখখানাকে ব্যঙ্গে বিকৃত করলে অমিতা: দীপঙ্করের মতো ছেলে পৃথিবীতে একটাই জন্মায় যেন। আবার ঘটা করে ফোটো পাঠিয়েছে কাল।

শিবেন মাথা তুলল। তাকিয়ে রইল মাছের চোখের মতো নির্বোধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

কেমন একটু আশ্চর্য মনে হল, অমিতা এবারে আর লক্ষ্য করছেনা শিবেনকে। সামনের দিকে মেলে দিয়েছে চোখ—যেখানে ট্যাঙ্কের জলটায় বেলাশেষের রঙ তুলছে একরাশ মরসুমী ফুলের পাঁপড়ির মতো। অমিতার চোখের তারায় ওই জলটা কাঁপছে, ওই আলোটা ছল্‌ছল্‌ করছে—ওই দূরের ম্লান-পাংশু আকাশটা মেদুর হয়ে রয়েছে। সে শিবেনের সঙ্গে কথা কইছেনা—যেন ঝগড়া করেছ বহু দূরের দীপঙ্করের সঙ্গে।

—ফোটো পাঠিয়েছে আবার। ভাবটা যেন দেখো কী চমৎকার চেহারা আমার। নেহাৎ লজ্জা করল তাই, নইলে ওই ছবিটা

মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমি ওর মাথায় গাধার টুপি এঁকে দিতাম।

অদ্ভুত অস্বস্তিভরে শিবেন উঠে দাঁড়াল হঠাৎ : আমার একটু কাজ আছে অমি—আজ আমি যাই।

গভীর নিমগ্ন চোখের ওপরে সেই জল আর রোদের দোলা নিয়ে অমিতা বললে, যাও। কিন্তু আমি তোমায় বলে রাখছি, তুমি যদি একটা ব্যবস্থা না করো, তা হলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে বিয়ের রাতে।

এই সেই বিয়ের রাত।

নিমন্ত্রণের চিঠিটা যথাসময়েই পেয়েছিল শিবেন। আর তার অক্ষম পরাভূত মনকে আরো বেশি অপমান করার জন্যেই যেন চিঠির পিঠে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন মমতা : তোমার আসাই চাই।

ঘরটাকে অন্ধকার করে পড়ে ছিল শিবেন। ভাবতে চেষ্টা করছিল পৃথিবীর কোথায় আছে সেই তিমিরান্ধ নিভৃতি—যেখানে তার পলাতক চেতনাকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে সে—যেখানে নিজের চোখ ছুটোকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে পারে আকাশের সমুদ্রে।

আর সেই সময় খবর এলো অমিতাকে বিয়ে করতে হবে তাকেই। নিতে পাঠিয়েছেন শৈলেশ নিজেই।

ট্যাক্সি হু হু করে ছুটেছে যাদবপুরের দিকে। একটা উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্ন দেখছে শিবেন। মাটি দিয়ে নয়, ট্যাক্সি চেপেও নয়, জ্বলন্ত কোনো হাউইয়ের মতো মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে সে। জীবন নয়—ফ্যান্টাসি!

অনেকটা জলের তলা থেকে মানুষ যেমন করে ওপরে ভেসে ওঠে, তেমনিভাবেই বাস্তবের সীমান্তে উদ্ভাসিত হল শিবেন। গাড়ি ততক্ষণে প্রায় গড়িয়াহাটা মার্কেটের কাছাকাছি।

দীপঙ্কর? দীপঙ্করের কী হল?

—মারা গেছে।

—মারা গেছে!—শিবেন চিৎকার করে উঠল। খবরটা বুকে এসে লেগেছে বন্দুকের গুলির মতো।

সেই বন্ধু—যে শিবেন আর অমিতার ব্যাপারটা জানত—শৈলেন-বাবুর পরিবারের সঙ্গেও যার একটা আত্মীয়তার সূত্র রয়েছে এবং যে পরমোৎসাহে শিবেনকে নিতে এসেছিল, অদ্ভুত নির্দয় আর জান্তব ভঙ্গিতে হেসে উঠল সে।

—জীবনটা শুধু নাটক নয়, কখনো কখনো মেলোড্রামাও বটে। ঠিক বিয়ে করতে বেরুবার আগেই কলঘরের আলোটা জ্বালাতে গিয়েছিল দীপঙ্কর। খানিকটা অবাধ্য কারেণ্ট চিরদিনের মতোই আটকে রেখেছে দীপঙ্করকে।

একবার শিবেনের মনে হল—কেন কে জানে মনে হল—বন্ধুর মুখটা সে চেপে ধরে দু হাতে।

ট্যাক্সি চলতে লাগল। যেন প্রাণপণে পালিয়ে চলল একটা নিশি-পাওয়া রাত্রির কাছ থেকে। দুপাশের আলোগুলো শিবেনের চোখে যেন মুঠো মুঠো বালি ছুড়ে দিতে লাগল, একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল শিবেন।

তারপরে আরো অনেক আলো। অনেক উৎসব, অনেক কোলাহল। তীক্ষ্ণ কান্নার মতো কয়েকটা শাঁখের আওয়াজ।

—এসো বাবা, তুমিই আমাদের বাঁচাও!—কেমন একটা চাপা কণ্ঠস্বর শৈলেশের: বিয়ের রাত্রেই এমন অমঙ্গল—তুমি উদ্ধার না করলে মেয়েটার আর গতি নেই।

অন্ধের মতো চলল শিবেন। সব দেখল, কিন্তু কিছুই দেখল না। শুধু একবার চোখ মেলল শুভ-দৃষ্টির সময়। এইবারে দেখবে তার অমিতাকে।

—মালা-বদল করো—পাশ থেকে কাকে বলতে শোনা গেল।

কিন্তু মালা-বদল করবে কার সঙ্গে শিবেন? তার অমিতা? সে তো কোথাও নেই! এ যে দীপঙ্করের বিধবা। এর সমস্ত মুখে শ্মশানের শূন্যতা খাঁ-খাঁ করছে! দিনের পর দিন দীপঙ্করকে অস্বীকার করতে গিয়ে তিলে তিলে দীপঙ্করকেই মেনে নিয়েছে সে—তিলে তিলে মুছে গেছে শিবেন!

এ কোন্ চির-বৈধব্যের গলায় মালা দেবে সে? কোন্ অভিশপ্ত শ্মশানে বসন্তের স্বপ্ন তার? মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরো বড় হয়ে গেছে দীপঙ্কর—আরো বিরাট, আরো জোতির্ময়!

অমিতার নিষ্প্রাণ বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের মালা মাটিতে পড়ে গেল শিবেনের। অবরুদ্ধ গলায় ভেতর থেকে বোবা কান্নার মতো বেরিয়ে এল: না—না, আমি পারব না!

তাস

ভাই বোন দুজনেরই তাস খেলার দারুণ উৎসাহ। অমূল্য প্রায় নামকরা খেলোয়াড়—একবার ব্রিজ টুর্নামেণ্টে সেমি-ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠেছিল। দাদার মত না হলেও নমিতাও কম যায় না—সে-ও বাহান্নখানা তাসের হিসেব গড়গড়িয়ে করে ফেলতে পারে।

মুশকিলে পড়েছে বাকি দুজন—অমূল্যের স্ত্রী রেখা আর নমিতার স্বামী অসিত।

রেখার বাবা বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনদিন তাসকে ঘেঁসতে দেন নি, ওই কর্মনাশা খেলাটাকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না তিনি। তাই রেখারও তাস দেখলে গায়ে জ্বর আসে। অমূল্য অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি—রেখাকে চলনসই রকমের খেলাও অন্তত শেখবার জন্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে, কি ভাবে কল 'ওপন' করতে হয় আর 'লীড' দেবার নিয়মই বা কী—চার ভাগে তাস সাজিয়ে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এমন কি কাল্‌বার্টসনের বই পর্যন্ত পড়িয়েছে। কিন্তু রেখার বিশেষ উন্নতি হয় নি, এখনও সে হরতন আর ইস্কাবনের মধ্যে গোলমাল করে ফেলে।

অমূল্য মধ্যে মধ্যে চটে ওঠে : এত করে যে বলি, কিছুই শুনতে পাও না না কি? না, এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়?

রেখা করুণ হয়ে বলে, কী করব, কিছুতেই মনে থাকে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

—গোলমাল হয়ে যায়?—আরও চটে অমূল্য : এতটুকু ম্যাথামেটিক্যাল ব্রেনও যদি না থাকে, তা হলে বি, এস-সি, পাস করলে কী ক'রে?

তাস খেলা বুঝতে পারে না তবু বি, এস-সি পাশ করেছে, নিজের কাছে অপরাধের মতোই মনে হয় রেখার : কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। একবার অনেক ভেবে-চিন্তে যদিই বা খানিকটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলল, কিন্তু ঠিক পর-মুহূর্তেই হয়তো এমন একটা কাণ্ড করে বসে যে, রেগে-মেগে শুধু নাচতে বাকি রাখে অমূল্য।

অসিতের অবস্থা আরও করুণ। ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া স্বামী আই, এ, ফেল স্ত্রীর কাছে বার বার ধিক্কার শোনে : আচ্ছা, তুমি কী! দেখছ না ট্রাম্প্‌সের খেলা—

মাথা চুলকে অসিত বলে, এর পরে আর ভুল হবে না—ঠিক বলছি।

পৌরুষে ঘা লাগে, মধ্যে মধ্যে অন্তত 'সিরিয়াস' ভাবে অসিত খেলাটাকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে পড়বার সময় সেই প্রথম সিগারেট খাওয়ার যুগে তাস খেলা শিখতে গিয়ে যা ঘটত, আজও তারই পুনরাবৃত্তি চলে। খেলতে খেলতে কখন চোখ বাইরে চ'লে যায়, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার দিনে যেমন জানালা দিয়ে তাকিয়ে শিরীষপাতায় রোদের ঝিলিমিলি দেখত—এখনও তেমনি তাকিয়ে দেখে নীল পাহাড়টার মাথায় পালে পালে শাদা মেঘ এসে কেমন করে জড়ো হচ্ছে।

চমক ভাঙে নমিতার চিৎকারে।

—এ কী করলে, কল ছেড়ে দিলে? আমাদের যে পাঁচটার খেলা হয়ে যেত!

অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আরও পুরো এক মাস এই যম-যন্ত্রণা সইতে হবে তাকে। গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙের এই চা-বাগানে

বেড়াতে আসবার সময় অনেক কাব্য আর কল্পনা ছিল মনে। কিন্তু স্পেড যে এমন করে কোদাল হয়ে তার মাথায় পড়বে আর হার্ট এমন হৃদয়হীনভাবে তার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেবে, সে ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা কে ভেবেছিল তখন!

এক দিকে মংপুর সিন্‌কোনা প্ল্যাণ্টেশন, অন্য দিকে ঘন কুয়াশা আর নিবিড় জাপানী পাইনের অরণ্য দিয়ে ছাওয়া ছাউনি হিল্‌স। এরই মাঝামাঝি জায়গায় একটা ইউরোপীয়ান টী-এস্টেট। যেন দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা।

কিন্তু সমতল অর্থে সী-লেভেল নয়, চার হাজার ফিটের ওপরে অল্‌টিচ্যুড। দু-ধারের ঢাল বেয়ে চা-বাগানের গাঢ় সবুজ ঢেউ নেমেছে,—মাঝে মোষের পিঠের মত জায়গাটাতে কারখানা, অফিস-কোয়ার্টার আর ছোট একটুখানি গঞ্জ। এই চা-বাগানেরই ডাক্তার অমূল্য।

গরমের ছুটি। কলেজ বন্ধ। কলকাতার অসহ্য এক শো পাঁচ ডিগ্রীতে অসিত যখন ছটফট করছিল, তখন অমূল্যের চিঠি এল নমিতার কাছে।

—গরমে কেন কষ্ট পাচ্ছিস ওখানে? অসিতকে নিয়ে চলে আয়। ভয় নেই, দার্জিলিং এখান থেকে অনেক দূরে। অসিতের ভালোই লাগবে।

দার্জিলিং অসিতের পছন্দ নয়। একবার বেড়াতে এসে দিন তিনেক থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল শ্যামবাজার আর বাগবাজার—কালীঘাট আর বালিগঞ্জ ওভারকোট পরে দার্জিলিঙে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেই হাতীবাগানের কাকা, সেই ভবানীপুরের কুট্টিমামা, কলকাতার সেই অসহ্য বন্ধুবান্ধবের দল,

সবাই যেন ভিড় ক'রে এসে জড়ো হয়েছে দার্জিলিঙে। তা হলে খামোকা কনকনে ঠাণ্ডা আর শিরশিরে বৃষ্টির উৎপাত সয়ে লাভ কী? তার চাইতে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

অমূল্যের চিঠিটা লোভ জাগিয়ে দিলে। দার্জিলিঙের পাহাড় রয়েছে, তার সব কিছু সৌন্দর্য আছে, অথচ কলকাতার লোকের উৎপাত নেই—এমন জায়গায় মাস দেড়েক কাটিয়ে আসবার নিমন্ত্রণটা অসিত উপেক্ষা করতে পারল না। অতএব যথানিয়মে নমিতাকে নিয়ে সে অমূল্যের চা-বাগানে উপস্থিত হল।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, খাসা জায়গা। 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে'—ইত্যাদি। শীত আছে বটে, কিন্তু দার্জিলিঙের মতো তীব্র নয়, সারা শরীরে যেন গোলাপী আমেজ বুলিয়ে দেয়। টী-প্ল্যান্টেশনকে অতিকায় মৌচাকের মত দেখায়, যেন মাটির বুক থেকে শুষে-নেওয়া সবুজ মধুতে টলমল করছে। কুর্চি, শানাই ফুল আর গুচ্ছ গুচ্ছ হাইড্রেঞ্জিয়ায় আলো হয়ে রয়েছে চারদিক। একটু দূরেই পুরোনো একটা শালবন, নিবিড়-নিবদ্ধ পাতায় পাতায় যেন আদ্যিকালের অন্ধকার, গাছের ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মতো শ্যাওলা ঝুলছে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কাক আর ময়নায় মেশানো এক রকম আশ্চর্য পাখি—দুটো-চারটে মৃদুকণ্ঠ ঝরণার সুরে সুর মেলায় শান্ত-করুণ সবুজ ঘুঘুর ডাক।

এই শালবনে ঘুরে, শানাই ফুল আর হাইড্রেঞ্জিয়ার গুচ্ছ তুলে দিন কয়েক সত্যিই ভারি আরামে কেটেছিল অসিতের। কিন্তু এ সুখ বরাতে বেশিদিন সইল না। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে টেপের খাটিয়ায় লম্বা হতে যাচ্ছে, এমন সময় ফটাফট শব্দে হাতে এক প্যাকেট তাস ভাঁজতে ভাঁজতে অমূল্য হাজির।

—আরে, এসব জায়গায় দুপুরে ঘুমুলে শরীর খারাপ করে, গা ভারি হয়ে যায়। তার চাইতে এসো এক বাজি তাস খেলা যাক।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন। কী করা যায়—উঠে বসতেই হল অসিতকে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে লাফাতে লাফাতে নমিতার প্রবেশ ঃ হ্যাঁ দাদা, সেই ভালো।

অগত্যা অনিচ্ছুক রেখাকেও উল বোনা ফেলে এসে যোগ দিতে হল তাসের আসরে। সেই যে শুরু হয়েছে, আর কামাই নেই তারপর থেকে। এখানে তাসের সঙ্গী না পেয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে ক্ষুধিত হয়ে ছিল অমূল্য, এবার সুদে-আসলে উশুল করতে শুরু করল। কেবল ডিস্‌পেন্‌সারির নিয়ম রক্ষা আর দুটো একটা কলে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তাস আর তাস! রইল পড়ে সবুজ ঘুঘুর মিষ্টি ডাকে-ছাওয়া পুরোনো শালবন—শানাই ফুলগুলো শীতে আর শিশিরে কুঁকড়ে কুঁকড়ে টুপটাপ করে ঝরে যেতে লাগল, আর অসিতের দু কান ভরে বাজতে লাগল ঃ নো ট্রাম্প্‌স্‌—ফাইভ ক্লাব্‌স্‌—রি-ডাব্‌ল্‌!

কলকাতায় পালাতে পেরেলে বাঁচা যায় এখন। প্রস্তাবটা তুলতেই প্রায় তেড়ে এল নমিতা।

ঃ এখনও তো এক মাস ছুটি রয়েছে। কী এমন রাজকার্যটা কলকাতায় প'ড়ে রয়েছে, শুনি? ওই গরমের ভেতরে গিয়ে হাঁড়ি-কাবাবের মতো সেদ্ধ হতে না পারলে বুঝি ভালো লাগছে না?

কিন্তু জেরবার হয়ে উঠেছে অসিত। শুধু মধ্যে মধ্যে আশ্বাস পাওয়া যায় রেখার পীড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে। তার দুঃখের ভাগীদার অন্তত আরও একজন আছে—আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

শাল দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অসিত। অমূল্য ডিস্‌পেন্‌সারিতে গেলে, এই ফাঁকে একবার প্রকৃতি-পর্যটন করে আসবে কি না সেই কথাটাই ভাবছিল। এমন সময় এক পেয়ালা চা নিয়ে রেখা ঘরে ঢুকল।

—জানালা দিয়ে বুঝি প্রকৃতির শোভা দেখছেন অসিতবাবু?

—প্রকৃতির শোভা!—অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল: পাহাড়টাকে এখন রুইতনের মতো দেখাচ্ছে, আর আকাশের মেঘগুলো যেন ঝাঁকে ঝাঁকে চিঁড়েতনের মতো উড়ে আসছে আমার দিকে।

রেখা খিলখিল করে হেসে উঠল। উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারার এই মেয়েটিকে হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়। রেখার হাসিটা আস্বাদন করে প্রসন্নতায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল অসিত।

—মনে হচ্ছে যেন রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে' বাস করছি। ওই গানটা জানেন—"ইস্কাবন চিঁড়েতন হরতন, অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন?"

আর একবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল রেখা। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, যা বলেছেন। আমার তো মধ্যে মধ্যে দস্তুরমতো কান্না পায়। কিন্তু ওদের ভাই-বোনের কী যে তাসের নেশা!—কিছুতেই বুঝবে না।

—আর জোর করে খেলতে বসাবে, একটু ভুল হলেই যা-তা গালমন্দ করবে।—সমর্থন পেয়ে আরও উৎসাহিত হল অসিত: খেলা, খেলা! এ তো আর ক্যাল্‌ক্যুলাসের অঙ্ক নয় যে, একটুখানি ভুল হলেই মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে? অথচ এমন চেঁচামেচি করে যে মনে হয় বুঝি লাখ টাকার জমিদারি নিলেমে উঠল।

—যা বলেছেন।—রেখা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল। তারপর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। অসিত চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, মধ্যে মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়, জানেন?

—প্রতিশোধ?—রেখা আশ্চর্য হল: কিসের প্রতিশোধ?

—এই অপমানের। ইচ্ছে করে এমন খেলা দেখিয়ে দিই যে, দুজনেই একেবারে জব্দ হয়ে যায়।

—কিন্তু পারবেন কী করে?—রেখা নিরাশ ভঙ্গিতে বললে, ওরা

ওরা যে দুজনেই পাকা খেলুড়ে। আপনার আমার সাধ্য কি ওদের জব্দ করি ?

—একটা চক্রান্ত করছি।—অসিত চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল : আপনি দলে আসবেন আমার ?

রেখা আবার হেসে উঠল : কেন আসব না ? ওদের জব্দ করার ব্যাপারে আপনার আমার ইণ্টারেস্ট্ সমান।

সন্তর্পণে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করলে, নমিতা কোথায় ?

—স্নান করতে ঢুকেছে।

—তা হলে সেদিক দিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। একখানা পুরো সাবান খরচ করে বেরুবে। আর অমূল্যদাও দশটার আগে আসছেন না। আসুন, এই বেলা আমাদের প্ল্যান ঠিক করে ফেলি।

—কী প্ল্যান ?

অসিত গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, চুরি করব।

—চুরি ! বলেন কী ?—রেখা দু চোখ কপালে তুলল : প্রোফে-সার মানুষ আপনি, ছাত্রদের মরাল গার্ডিয়ান। আপনি চুরি করবেন কি রকম ?

—রেখে দিন মরাল গার্ডিয়ান !—উত্তেজিত ভাবে সশব্দে সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করলে অসিত : তাসে চুরি করায় দোষ নেই। মনুর আমলে ভারতবর্ষে তাস খেলার রেওয়াজ ছিল না, নইলে তিনিও আমায় সাপোর্ট করে যেতেন। বুঝছেন না, নইলে কিছুতেই ওদের কায়দা করা যাবে না।

—বুঝলাম।—রেখা স্মিত হাসিতে বললে, কিন্তু চুরিটা হবে কী ভাবে ?

— কয়েকটা হিণ্ট্ দিচ্ছি আপনাকে। ধরুন, আমি যদি বাঁ

হাত দিয়ে কান চুলকোই, তা হলে বুঝলেন আমার হাতে ইস্কাবন নেই। ডান হাত দিয়ে গাল চুলকোলে হয়তো বুঝবেন, আমি আপনাকে স্পেডে লীড্ দিতে বলছি। কিংবা ধরুন, প্রথমে যে কল দিয়ে খেলা শুরু করলাম, আমার হাতে সেটা উইকেস্ট, অর্থাৎ ওদের কল নষ্ট করে দেবার মতলব—

কৌতুকে রেখার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: অত গড়গড় করে বললে তো হবে না, আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া আমি তো আপনার অ্যান্টি-পার্টি—

অসিত বাধা দিয়ে বললে, আজ থেকে আমরা পার্টনার।

সেদিন তুপুরে খেলতে বসেই অমূল্য স্তম্ভিত।

—সে কি?—অসিত আর রেখা পার্টনার! খেলবে কি হে! তুজনেই তো সমান।

অসিত মুখ টিপে হাসল: দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। এতদিন ধরে তালিম দিচ্ছ, কিছুই কি আর উন্নতি হয় নি?

নমিতা খুশি হয়ে উঠল: বেশ তো দাদা, খেলুক না ওরা। কিন্তু স্টেকে খেলা হবে আজ। হাজারে তু আনা।

অসিত বললে, রাজী।

কিন্তু খানিক পরেই অস্বস্তিতে অমূল্য আর নমিতা ছটফট করে উঠল। ব্লাফ্ কল আর এলোপাথাড়ি আক্রমণে ওদের তুজনের পাকা খেলোয়াড়ী বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে লাগল। চুরির নিষিদ্ধ আনন্দে অদ্ভুত উত্তেজনায় আশ্চর্য ভালো খেলতে লাগল অসিত, রেখাও যে দরকারমতো এমন মারাত্মক লীড দিতে পারে সে কথাই বা কে ভেবেছিল!

খেলার শেষে হিসেব করে দেখা গেল, অসিত আর রেখার পয়েন্টই বেশি, মোট ছ' আনা জিতে নিয়েছে ওরা।

অমূল্য মাথা চুলকে বললে, মির‍্যাক্‌লে বিশ্বাস করতে পারতাম না, এখন দেখছি তাও ঘটে !

নমিতা গজ গজ করতে লাগল : বা রে, অমন ভাবে, ব্লাফ্‌ দিলে কেউ খেলতে পারে নাকি ?

—এ ভারি অন্যায়।

অসিত বললে, অন্যায় আবার কী ! তোমাদের যা খুশি কল নাও না, আমরা কি বারণ করেছি নাকি ?

চাপা হাসিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল রেখার চোখ।

পরদিন সকালে আবার যখন এক ঘণ্টার জন্যে নমিতা বাথরুমে ঢুকেছে আর অমূল্য গেছে ডিস্‌পেন্‌সারিতে, নিয়মমতো চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঢুকল রেখা।

এসেই উচ্ছ্বসিত হাসি : কী মজা হল বলুন তো !

হাসিটা ভারি সুন্দর। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল অসিত। তারপর পরিতৃপ্ত মুখে বললে, মজার এখনি কী হয়েছে ! দেখবেন না আজ কী করি ! নতুন টেকনিকে নতুন আক্রমণ।

—নতুন টেকনিকে ?

—এক রকম হিন্ট রোজ দিলে ওরা ধরে ফেলবে। তা ছাড়া দেখছিলেন তো, নমিতা কাল রীতিমত সন্দেহ করছিল দু-একবার। আমাকে তো ফস করে জিজ্ঞেস করেই বসল, বার বার নাক চুলকোচ্ছ কেন, সর্দি হয়েছে নাকি ? আজকে নতুন কোড।

—কী রকম ?

—বসুন, বুঝিয়ে বলি।

বাহান্নখানা তাসের মধ্যে এত রোমাঞ্চ আর এমন উত্তেজনা

আছে এর আগে কে জানত সে কথা? এতদিন পরে নেশা ধরেছে অসিতের, আর সে নেশা রেখার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এখন সকালবেলাতেই পাহাড়টাকে রুইতনের মতো মনে হয় না অসিতের। দুপুরে খেলতে বসবার আতঙ্ক বিভীষিকার মতো তাড়না করে না তাকে। বরং একটা বিচিত্র আগ্রহ নিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে অসিত প্রতীক্ষা করতে থাকে—দুপুরবেলা অমূল্যের জরুরি ডাক পড়লে অসিতই ক্ষুব্ধ হয় বেশি। বোঝা যায়, রেখারও প্রায় একই অবস্থা। কাজের ভেতরে সেও যেন ছটফট করে বেড়ায়। নমিতার চোখ এড়িয়ে মধ্যে মধ্যে এসে দাঁড়ায় অসিতের কাছে। ফিসফিস করে বলে, আজকের হিণ্টগুলো কী বলুন তো? আর একবার মনে করিয়ে দিন, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

একটা চমৎকার অন্তরঙ্গ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে দুজনের মধ্যে। অমূল্য আর নমিতার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। কৌতুকে আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দুজনে।

—কাল নমিতার মুখের অবস্থা দেখেছিলেন?

—ওঁর অবস্থাও খুব করুণ। কী ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

—দাঁড়ান না, আরও অস্ত্র আছে আমার তূণে। এক-একটা করে বার করব।

আবার রেখার সেই উজ্জ্বল উচ্ছ্বলিত হাসি। রেখার চিবুকের নীচের ভাঁজটা এত সুন্দর, দার্শনিক অধ্যাপক অসিত এর আগে সেটা লক্ষ্যই করে নি। হঠাৎ এক সময় অসিতের মনে হয়, এই মার্জিত দীপ্ত মেয়েটির পাশে অমূল্য যেন অনেকখানি স্থূল, কেমন যেন বেমানান।

আর রেখা বলে, নমিতা কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

হবেই তো। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অসিত বলে, আর কোনোদিকে তো লক্ষ্য নেই। পড়ে পড়ে ঘুমোবে আর বাংলা সিনেমা দেখবে, এ ছাড়া তো কাজকর্ম নেই কিছু। এখনি হয়েছে কী, কিছুদিন পরে দেখবেন তেলের কুপোর মত গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে।

—যাঃ, কী যে বলেন !—জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সৌজন্যের খাতিরে হাসিটাকে সংযত করে রেখা। আর অসিত তাকিয়ে দেখে নাচের 'ফিগারে'র মত ছিমছাম কমনীয় শরীর রেখার—সংস্কৃত কবির ভাষায় 'পল্লবিনীলতেব'।

তাস, তাস আর তাস। কিন্তু এখন শুধু 'হিন্ট'ই নয়, ফার্স্ট-ক্লাস-পাওয়া ছাত্র তার সমস্ত মনোযোগ কেবল তাসের ওপরেই উজাড় করে দিয়েছে। খেলতে খেলতে এখন আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় না, পুরোনো শালবনের আদিম অন্ধকারে সবুজ ঘুঘুর ডাক আর মনকে উদাস করে দেয় না, পাহাড়ের নীল মাথার ওপর শাদা শাদা ঘুমন্ত মেঘগুলো অসিতকে আর শ্রান্তিতে অবসন্ন করে আনে না। সমস্ত উৎসাহ আর বুদ্ধিকে সজাগ করে রেখে তাসের নির্ভুল হিসেব করে অসিত, বুঝতে পারে খেলাটা কত সহজে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। রেখাও সজাগ আর সতর্ক হয়ে উঠেছে, দুজনকে দুজনের চেনা হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। চোখ তুললেই অসিত দেখতে পায়, রেখার উজ্জ্বল চোখের গভীর বিশ্বাসভরা অন্তরঙ্গ দৃষ্টি তারই মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রয়েছে।

সংসারে তাস খেলার মতো ভালো জিনিষ আর নেই, এ সম্বন্ধে অসিত নিঃসন্দেহ এখন। রেখাও একমত তার সঙ্গে।

সেদিন দুপুরে খেলাটা কিন্তু জমল না।

সবে তাস পেড়ে অমূল্য বসতে যাবে, এমন সময় ভগ্নদূত এল।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারখানায়। ওয়েদারিং হাউসের দোতলা থেকে একজন জমাদার সোজা পড়ে গেছে নীচে, গোটা দুই পাঁজর ভেঙে গেছে খুব সম্ভব। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল অমূল্য।

বিষণ্ণ হয়ে অসিত বললে, তা হলে তিন হাতেই হোক।

রেখা বললে, তাই ভালো।

কিন্তু নমিতা রাজী নয়। কেমন নার্ভাস হয়ে গেছে আজকাল, অমূল্য না থাকলে ভরসা পায় না। হাই তুলে বললে, না না, সে জমবে না। তার চেয়ে গিয়ে একটু গড়াই, একটা নতুন সিনেমার পত্রিকা এসেছে, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি গে।

রেখা ক্ষুব্ধ চিত্তে বললে, আজ তা হলে খেলাটা আর হল না?

—কই আর হল?—অসিত হতাশ ভাবে সিগারেট ধরাল: অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েই লোকটা সব মাটি করে দিলে।

—কী করবেন তা হলে? ঘুমোবেন?

—এখানে ঘুমুতে ডাক্তারের বারণ, মাথা ভার হয়ে যাবে, গা ম্যাজ ম্যাজ করবে।—অসিত বললে, একটা বই-টই দিন, পড়ি।

—বই বলতে তো সিনেমা-ম্যাগাজিন আর মেটিরিয়া মেডিকা।—আসন্ন হাসির সূচনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রেখার চোখে মুখে: চলবে?

—তবে তো মুশকিল!

—মুশকিল কেন?—রেখাই মুশকিল আসান করে দিলে: চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

—চমৎকার প্রস্তাব।—অসিত সোৎসাহে উঠে বসল: চলুন।

—নমিতাকে ডাকব?

—ক্ষেপেছেন? লেপ মুড়ি দিয়ে সিনেমার কাগজ নিয়ে শুয়েছে,

এখন ওকে ওঠানো আর বিন্ধ্যপর্বতকে নড়ানো একই কথা। চলুন, আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

খুশিতে রেখার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল ঃ চুপি চুপি ?

—হ্যাঁ, চুপি চুপি।

—তবে দাঁড়ান, স্কার্ফটা নিয়ে আসি।—প্রায় নিঃশব্দে পাখির মতো উড়ে গেল রেখা।

কুর্চি ঝরে ঝরে পড়ছে পথের ওপর। মিষ্টি লালচে রোদে দুধের মত সাদা শানাই ফুল হেসে উঠেছে। হাইড্রেঞ্জিয়ার স্তবকে মৌমাছি আর বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির আনাগোনা। টেলিগ্রাফের তারে মাকড়শার জালে জড়ানো কুয়াশার কণায় রোদ ঝিকমিক করছে—যেন মুক্তোর ঝালর দুলিয়ে দিয়েছে কেউ। কলকণ্ঠে কথা বলে চলেছে রেখা।

—কতদিন ইচ্ছে করে এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই ; কিন্তু ওঁকে তো জানেন ! ওঁর এসব কাব্য-টাব্য করবার সময় নেই। বলেন, বেড়াতে হয় একাই যাও—আমার অত পাহাড় ঠ্যাঙাতে উৎসাহ হয় না। অথচ বলুন তো, একা একা কেউ বেড়াতে পারে এ ভাবে ? আর সংসারের কাজ করতে করতে আমি এ সব তো প্রায় ভুলতেই বসেছি। জানালা দিয়ে একটু বাইরে তাকিয়ে থাকারও সময় পাই না—ভয় হয় উনুনে বসানো ডালটা বুঝি পুড়ে গেল !

চলতে চলতে খুশিমতো ফুল তুলল রেখা, গুনগুন করে গান গাইল দু-চার কলি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েটিকে যেন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরী মেয়ের মতো দেখাচ্ছে—মনে মনে ভাবল অসিত।

তারপর সেই পুরোনো শালবন। অনাদি কালের বিষণ্ণ শীতল ছায়া দিয়ে ঘেরা। গাছের গুঁড়িতে ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মতো শ্যাওলা ঝুলছে। কাক আর ময়নায় মেশানো পাখিরা খুঁটে খুঁটে কী যেন খেয়ে চলেছে। ঝরণার মৃদু কল-ঝঙ্কার আসছে কোথা থেকে, ঘুম-ভরা গলায় সবুজ ঘুঘু ডেকে চলেছে অবিশ্রাম।

নির্জনতা। পৃথিবীর প্রাথমিক নির্জনতা। যেন ওরা আসবার আগে এখানে আর কোনও মানুষের পা কখনও পড়ে নি। রেখার মসৃণ কোমল শরীরটাকে কেমন অপার্থিব বলে মনে হল অসিতের। শীতল নিস্তব্ধ ছায়ায় তার নিবিড় চোখ দুটো আশ্চর্য আলোয় জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ গভীর গলায় অসিত বললে, আসুন, এই পাথরটার ওপরে বসি দুজনে।

রেখা বসল, অসিত বসল। ঝরণার শব্দ, পাখির ডাক। টুপটাপ করে শিশির পড়বার আওয়াজ। দুজনের । আর কেউ নেই।

মৃদু আবিষ্ট স্বরে রেখা বললে, আর কেউ নেই।

অসিত বললে, না, শুধু আমরা দুজন। আমরা দুজন পার্টনার।

—শুধু আমরা ছাড়া আমাদের কথা কেউ জানে না, না?

—না, আর কেউ জানে না।—অসিতের গলা ভারী হয়ে এল: আর কেউ জানবে না।

কী ছিল কথাটার সুরে? হঠাৎ শিউরে উঠল রেখা। হঠাৎ মনে হল, দুজনে বড় বেশি কাছাকাছি বসে আছে—অসিতের ঠাণ্ডা নিশ্বাস লাগছে ওর গায়ে। একটা সীমাহীন ভয়ে রেখার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। এ তো শুধু ত্রাস নয়! এ ওরা কোথায়

চলেছে? এই নিরালা আদিম শালবনের মধ্য দিয়ে কোন্ ভয়ঙ্কর পথ দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে?

রেখা উঠে দাঁড়াল তড়িৎবেগে। সঙ্গে সঙ্গে অসিতও। সে কি বুঝতে পেরেছে কিছু? আভাস পেয়েছে অন্তত?

স্কার্ফটায় শীত আর বাগ মানছে না যেন। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে আওয়াজ তুলে রেখা বললে, চলুন, ফেরা যাক।

অসিত জবাব দিলে না। তার আগেই সে হাঁটতে শুরু করেছে।

ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল নমিতা।

—এমন বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বউদি? কী পুড়ছে উনুনে?

বউদির জবাব এল না; কিন্তু অসিত বুঝতে পেরেছিল, কী পুড়ছে। মোটা কম্বলে মাথাটা পর্যন্ত ঢেকে খাটিয়ার ওপর পড়ে রইল অসিত। কম্বলের আড়ালেই কি মুখ লুকোনো যাবে চিরদিনের মতো?

দু প্যাকেট তাস পুড়তে সময় লাগে। সেই সঙ্গে বুকের ভেতরটাও ধিকিধিকি করে পুড়ছে রেখার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখছে, প্রত্যেকখানা তাস কী অদ্ভুতভাবে বেঁকে বেঁকে পুড়ে যাচ্ছে—

মনে হচ্ছে, অসংখ্য কেউটে সাপের ফণা।

লজ্জা

বিনয় যেদিন তাদের বাড়িতে প্রথম এল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে উজ্জ্বলার।

চায়ের পেয়ালা সামনে বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। রবিবারের প্রকাণ্ড কাগজ—আপিসের ছুটি। সব তন্ন-তন্ন ভাবে শেষ করে বাবা এবার অকারণ কৌতূহলে 'ওয়াণ্টেড' কলমে মন দিয়েছিলেন।

উজ্জ্বলা ঘরে ঢুকল।

—এই ড্যাফোডিল্‌স্ কবিতার শেষ লাইন ক'টা বুঝিয়ে দাও বাবা।

—ড্যাফোডিল্‌স্! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ?—বাবা বইটার দিকে হাত বাড়ালেন।—দেখি?

ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে বিনয় ডাকল, দুর্গেশবাবু আছেন?

সন্ত্রস্ত হয়ে বাবা সাড়া দিলেন, কে, বিনয়? এসো—এসো—

বিনয় ঘরে ঢুকল। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল। গায়ে আস্তিন-গোটানো আধময়লা শার্ট। চোখে মোটা কাচের চশমা আর তার ভেতর থেকে একটা অর্থহীন উদাস দৃষ্টি। ফিলজফিতে এম, এ, পড়ে ছেলেটি, চেহারা চলাফেরাতেও পুরোদস্তুর দার্শনিক।

দুর্গেশবাবু বললেন, কী খবর ? বোসো—বোসো—

বিনয় অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে একটা চেয়ারের একান্তে বসে পড়ল। আশ্চর্য শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। যেন দুর্গেশবাবুকে দেখছে না, উজ্জ্বলাকেও না। বিনয় বললে, কাল আমাদের বাড়ি জগদ্ধাত্রী-পুজো। দয়া করে আপনারা সবাই আসবেন।

এটা প্রতি বছরের প্রথা ; কিন্তু বিনয় কোনোবার আসে নি। গত বছর পর্যন্ত ওর বাবা বেঁচে ছিলেন, এ সব সামাজিক কৃত্য তিনিই করে বেড়াতেন। এবার তিনি না থাকায় দায়টা বিনয়ের ওপরেই বর্তেছে।

দুর্গেশবাবু বললেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়। মায়ের পুজো, তার জন্যে কি আর নেমন্তন্ন করবার দরকার আছে ! এ তো আমরা এমনিই যাব।

বিনয় উঠে দাঁড়াল : তবে আমি আসি।

হঠাৎ কী যে ভাবলেন দুর্গেশবাবু, তিনিই জানেন। উজ্জ্বলাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আর বিপন্ন করে বলে ফেললেন, একটা উপকার করো দেখি বিনয়। তুমি তো স্কলার ছেলে—এই ড্যাফোডিল্‌স্‌ কবিতাটা সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দাও তো মেয়েটাকে। আমরা সেই কবে পড়েছি, ও-সব কি আর মনে আছে ছাই !

লজ্জায় লাল হয়ে পালাবার উপক্রম করল উজ্জ্বলা।

—না বাবা থাক্‌, আমি নিজেই পড়ে নেব এখন।

—নিজেই পড়ে নিবি কেন ?—দুর্গেশবাবু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : বিনয়ের মত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র যখন এসেই পড়েছে, তখন ছেড়ে দিবি ওকে ? আরে, পাড়ার ছেলে, আর বলতে গেলে তো জ্ঞাতির মধ্যেই পড়ে। ওর কাছে লজ্জা কী ? দাও তো বিনয়, দু কথায় ওকে বুঝিয়ে দাও কবিতাটা।

বিনয় আবার চেয়ারের কোণায় বসে পড়ল। বললে, বেশ তো দিন বইটা।

আশ্চর্য সহজ গলা, কোনও সঙ্কোচ নেই, বিব্রত হওয়ার ভাব নেই কণামাত্রও। অথবা সঙ্কোচ করবার কোনও প্রশ্নই ওঠে নি বিনয়ের মনে। তেমনি উদাসীন আর আত্মমগ্নতার দৃষ্টি—উজ্জ্বলাকে সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না যেন।

বই এগিয়ে দিতে হাত কাঁপছে উজ্জ্বলার; কিন্তু বিনয় লক্ষ্যই করল না। বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলে চলল, আপনার ডিফিক্যাল্‌টি কোথায়? শেষ চারটে লাইন? For oft when on my couch I lie? বোধ হয় জানেন, এই ক'টা লাইন কবি নিজে লেখেন নি—

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বিনয় যখন থামল, তখন আনন্দে ঘন ঘন দুর্গেশবাবুর মাথা নড়ছে, আর উজ্জ্বলা নিবিড় মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বিনয়ের দিকে। বিনয়ের কথার অর্ধেকও সে বুঝতে পারে নি, সে তার বুদ্ধির বাইরে; কিন্তু এমন আশ্চর্য সুরেলা গলায় কেউ যে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, এমন চমৎকার উচ্চারণে অনর্গল ইংরেজী বলতে পারে, কথা বলতে বলতে কারও শূন্য স্তিমিত চোখ যে বুদ্ধি আর প্রতিভার আলোয় এমন ঝকঝক করে জ্বলে উঠতে পারে, উজ্জ্বলা তা জানত না।

হঠাৎ দুর্গেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: সুপার্ব্‌! ইউনিক!

তাঁর চিৎকারটা এতক্ষণের মোহাবিষ্টতার ওপরে একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করল উজ্জ্বলা।

দুর্গেশবাবু বললেন, কিছু মনে কোরো না বিনয়, কলেজে পড়বার সময় ডক্টর ঘোষের ইংরিজী শুনেছিলাম আর এই শুনলাম তোমার মুখে। সিম্প্‌লি ওয়াণ্ডারফুল! আমার এই মেয়েটা ইংরেজীতে বড় কাঁচা, যদি সময় করে মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু ওকে

পড়িয়ে দাও—বড় উপকার হয় তা হলে। আর তা ছাড়া—তোষামোদের ভঙ্গিতে দুর্গেশবাবু হাসলেন: বলতে গেলে তোমরা তো ঘরের লোক, জ্ঞাতির মধ্যেই পড়ো। এটুকু জোর করতে পারি তোমার ওপর।

বাবার কথার ভঙ্গিটা ভারি বিশ্রী লাগল উজ্জ্বলার কানে। ইচ্ছে হল, প্রতিবাদ করে বলে, এ আমাদের অন্যায় জুলুম বাবা। উনি কেন কাজের ক্ষতি করে সময় নষ্ট করবেন আমার জন্যে ?

কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখা দিল না বিনয়ের মুখে। তেমনি নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে বইটা উজ্জ্বলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, বেশ তো, আসব।—এতটুকু আগ্রহের দীপ্তি নেই মুখে, এক বিন্দু বিরক্তির চিহ্নও না। উজ্জ্বলা হঠাৎ কেমন অপমানিত বোধ করল নিজেকে।

তার পরেই উঠে পড়ল বিনয়। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, তবে আজ আসি দুর্গেশবাবু, আমাকে আরও তিন-চার জায়গায় বলে যেতে হবে।

উজ্জ্বলা ভেবেছিল ওটা কথার কথা, সৌজন্য বজায় রেখে চলে যাওয়া। তার পরে রাস্তায় বেরিয়েই বিনয় সে কথা একেবারে ভুলে যাবে। আজ পাঁচ বছর ধরে সে তো এই পথ দিয়েই বিনয়কে যেতে-আসতে দেখতে পায়। অদ্ভুত আত্মমগ্ন মানুষ—সহজে কারও সঙ্গে কথা বলে না, ফিরে তাকায় না কারও দিকেই। পাড়ার লোকে বলে, ছেলেটা পাগল। দিনরাত বইয়ের ভেতরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, আর কিছু যেন দেখতেই পায় না। দু পায়ে দু রকম জুতো পরে হাঁটে, উল্টো জামা গায়ে

দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে শেষে প'কট খুঁজে পায় না, একটা পয়সা সঙ্গে না নিয়েই ট্রামে উঠে বসেছে কতদিন। অদ্ভুত ভুলো মানুষ, কলেজ থেকে নিজের বাড়িতে কী করে যে ফিরে আসে সেইটেই আশ্চর্য!

কিন্তু এবার বিনয় প্রমাণ করে ফেলল যে, কোনো কোনো কথা তার মনেও থাকে। তাই দিন পাঁচেক পরে সন্ধ্যাবেলায় তার ডাক পড়ল ঃ দুর্গেশবাবু!

দুর্গেশবাবু বাড়িতে ছিলেন না, উজ্জ্বলাকেই দরজা খুলে দিতে হল।

—বাবা এখন নেই।

বিনয় বললে, তা হোক। আমি তোমাকে ইংরাজী পড়াতে এসেছি।

কয়েক মুহূর্ত আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল উজ্জ্বলা। তারপরে দেখতে পেল, শিশুর মত শান্ত একটা সারল্য বিনয়ের মুখে—চোখে সেই আত্মমগ্ন বিচিত্র দৃষ্টি

একটু চুপ করে থেকে বিনয় বললে, আজ পড়বে, না, আর একদিন আমি আসব?

উজ্জ্বলা বললে, না না, আজই আসুন।

সেই থেকে শুরু। বিনয় ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে এম. এ, পাস করল, শুরু করল রিসার্চ। উজ্জ্বলা ভর্তি হল কলেজে। এখনও নিয়মিত আসে বিনয়—সপ্তাহে দু-তিন দিন করে ইংরেজী পড়িয়ে যায়—সংস্কৃত কিংবা লজিকও দেখিয়ে দিয়ে যায় কোনো কোনো দিন। আরও নিজের দশটা কাজের মত ওটাও যেন অভ্যাস করে নিয়েছে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পড়ায়—ধ্যানস্তিমিত চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে থাকে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে এক সময়।

—আজ চললাম, আমার কাজ আছে।

মধ্যে মধ্যে একটা তীব্র অন্তর্জ্বালায় ঠোঁট কামড়ে ধরে উজ্জ্বলা। অদ্ভুত নির্দয় মনে হয় বিনয়কে। বই আর বই— কথা আর কথা। অথচ উজ্জ্বলার সব সময়ে তা ভালো লাগে না। কখনও কখনও ভাবেঃ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুক বিনয়— দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে থাক্ কয়েক মিনিট, বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকুক, আর দুরু দুরু বুকে উজ্জ্বলা ভাবুক—এখুনি এমন একটা কিছু ঘটবে, যা এর আগে কখনো ঘটে নি।

কিন্তু দু বছরে তা ঘটল না। অনেক বৃষ্টি পড়ার সন্ধ্যা বাইরে সেই আশ্চর্য সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করেছে—কথা না বলার সেই আশ্চর্য মুহূর্ত বহুবার ঘন হয়ে ওঠবার আগেই মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। বইয়ের পাতার কোটরের বাইরে পলকের জন্যেও বেরিয়ে আসে নি বিনয়। বরং চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বলেছে যে, বৃষ্টির ছাট্ আসছে—জানালাটা বন্ধ করে দাও।

এদিকে তলায় তলায় বইতে শুরু হয়েছে অন্তঃশীলা। বিনয়ের বিধবা মা কিছুদিন ধরে যাওয়া-আসা করছেন উজ্জ্বলাদের বাড়িতে। তাঁর ওই একটি মাত্র ছেলে, তাকে সংসারী না করলে সংসারে আর মন টিকছে না তাঁর। একটি ভালো পাত্রী যদি তিনি পান—

তারপর বুকের মধ্যে ঝড়-ওঠানো সেই ভয়ঙ্কর খবর একদিন শুনতে পেল উজ্জ্বলা। বিনয়ের মা তাকেই পুত্রবধূ করার কথা ভাবছেন। বিনয় এতদিন ধরে যখন এ বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে, তখন নিশ্চয়ই—। আর উজ্জ্বলা মেয়েটি সম্পর্কে বিনয়ের মারও লোভ আছে অনেক দিন থেকেই। কিছুই দিতে পারবেন না দুর্গেশবাবু—তা হোক। তাঁদের আশীর্বাদে বিনয়ের বাবা যা রেখে গেছেন—

অসহ্য আনন্দে আর দুর্বোধ একটা যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ মুখ বুজে বিছানায় পড়ে রইল উজ্জ্বলা। শেষ পর্যন্ত পুঁথির পাতা থেকে নেমে বিনয় ধরা দিতে আসছে তারই জীবনে! ওই ঘুমন্ত পুরুষটি তারই ছোঁয়ায় এবার জেগে উঠবে ধীরে ধীরে, শিশুর মতো বিস্ময়চকিত চোখ মেলে তাকাবে তার দিকে, বলবে—

বিনিদ্র রাতের প্রহর-জাগা শুরু হল উজ্জ্বলার। শুরু হল আকাশের তারা-কুড়োনো।

কিন্তু তিন দিন পরেই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বিনয় এসে হাজির হল দুর্গেশবাবুর বাড়িতে। দুর্গেশবাবু সবে আপিস থেকে ফিরেছেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ে বসতে দিলেন।

বিনয় কোনো ভূমিকা করলে না। ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে আরও খানিকটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে বললে, কী পাগলামি শুরু করেছেন আপনারা?

দুর্গেশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন: মানে?

—মানে আপনারাই ভালো জানেন। উজ্জ্বলার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার আইডিয়া আপনাদের হল কী করে?—শান্ত উদাসীন বিনয়ের স্বরে স্পষ্ট বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে বেরুল: এই নিয়ে এই মাত্র মার সঙ্গে আমার কতগুলো আনপ্লেজেন্ট আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয় ভেবেই উজ্জ্বলাকে আমি পড়াতে আসি, কিন্তু বিয়ে করার কথা উঠতে পারে তা বুঝলে আমি আপনাদের এখানে কখনও আসতাম না।

দুর্গেশবাবু নিভে গেলেন একেবারে: এ তুমি কী বলছ বিনয়? এত আশা করে আছি আমরা। কথাবার্তা প্রায় ঠিক—

নির্বাক নিরুত্তেজ বিনয় অবিশ্বাস্য ভাবে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল: কথাবার্তা কে আপনাদের ঠিক করতে বলেছিল? বিয়ে করব আমি, অথচ আমার মতামতের কোনও প্রশ্নই নেই! চমৎকার!

দুর্গেশবাবু শেষ চেষ্টা করলেন : কিন্তু উজ্জ্বলা তো—

—খুবই চমৎকার মেয়ে। সেই জন্যেই তো আরও বলছি, ওকেও কেন জড়াচ্ছেন এসব ক্ষ্যাপামির ভেতরে? আমি এখন বিয়ে করব না, ভবিষ্যতেও বিয়ে করার জন্যে কোনো আগ্রহ আমার নেই। তা ছাড়া আর একটা কথা। উজ্জ্বলাকে পড়ানো নিয়েই যখন এত গোলমাল উঠেছে, তখন ভবিষ্যতে আর আমি এ-বাড়িতে পড়াতে আসব না।

যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত বেগে নিজের বক্তব্য শেষ করে বেরিয়ে গেল বিনয়। দুর্গেশবাবু স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলেন। আর ঘরের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল উজ্জ্বলা, সেই-খানেই সে নিথর হয়ে রইল—এক পাও নড়তে পারল না।

আজ উজ্জ্বলার বিয়ে।

কে পাত্র, কী তার পরিচয়—কেউ তা ভাল করে জানে না। এমন কি, মেয়ে পর্যন্ত দেখতে আসে নি কেউ। দুর্গেশবাবু কোথা থেকে কী যে বন্দোবস্ত করেছেন, একমাত্র তিনিই তা বলতে পারেন।

উজ্জ্বলা একটা কথা বলে নি, একবারের জন্যেও প্রতিবাদ তোলে নি। যার খুশি আসুক, যে খুশি তাকে তুলে নিয়ে যাক। সব সমান তার কাছে। বিনয় চলে যাওয়ার পর থেকেই সে বুঝতে পেরেছে, জীবনে আর কোনো কিছুই তার দরকার নেই। সমস্ত আশঙ্কার ওপরে দাঁড়ি টেনে দিয়ে একটা পরম নির্বেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে সে। বিনয়ের মতই তারও চিন্তা-ভাবনা নিরাসক্তির নেশায় আচ্ছন্ন।

বিনয়! চেলী-চন্দন-পরা উজ্জ্বলা নির্দয় ভাবে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার। আজই শেষ। এর পরে বিনয়ের কথা আর কোনোদিনই তার মনে পড়বে না। বিনয় যদি এত সহজেই তাকে ভুলে যেতে পেরে থাকে, তারও মনে রাখবার দায় নই।

বাইরে বাজনার আওয়াজ—শঙ্খে ফুঁ উঠছে ঘন ঘন। একটা প্রবল কোলাহল।

একটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এল: উজ্জ্বলাদি বর এসে গেছে তোমার।

একবার, শুধু একবারের জন্যে। উজ্জ্বলার ইচ্ছে হল, এই মালা, এই গয়না—সব সে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়, ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে পরনের চেলী। তার পর—

হঠাৎ নীচের কোলাহলটা এক প্রবল বিশৃঙ্খলায় পরিণত হল। যেন মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

—বুড়ো—বুড়ো বর! ষাট বছরের বুড়ো!—কে যেন চিৎকার করে উঠল।

—মাথার সব চুল শাদা। মুখে দাঁত নেই বললেই হয়।

—মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে!

উজ্জ্বলার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। এই ভালো হয়েছে—এর চাইতে ভালো কী আর হতে পারত! সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চির নির্বাণ, একেবারে পরিপূর্ণ সমাধি। দু বছর পরেই হয়তো শাদা থান পরে ব্রহ্মচর্যের তপস্যা।

চমৎকার! তিলে তিলে আত্মহত্যা করবার ভদ্র উপায় এর চাইতে কী আর হওয়া সম্ভব!

নীচে বিশৃঙ্খল চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঝড় বইছে যেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর যে-ঘরে উজ্জ্বলা

বসে ছিল, সেখানে ঢুকলেন বিনয়ের মা। পেছনে পেছনে মা এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে, বাবা এলেন অপরাধীর মতো।

দু চোখে আগুন ছড়িয়ে বিনয়ের মা বললেন, এটা কী করছেন দুর্গেশবাবু ?

—কী করা যায় বলুন ! আমার যা অবস্থা—

—তাই বলে কশাইয়ের মতো জবাই করবেন মেয়েটাকে ?

দুর্গেশবাবু কেঁদে ফেললেন ঃ আমার দশা দেখুন এখন। পাড়ার ছেলেরা তো বরের গাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, কিছুতেই নামতে দেবে না। অথচ সব হয়ে গেছে, লগ্ন বয়ে যায়—

বিনয়ের মা বললেন, সে আমি দেখছি।—তারপর গলা তুলে তীব্রস্বরে ডাকলেন ঃ বিনয় !

ঘরের বাইরেই বোধ হয় বিনয় দাঁড়িয়ে ছিল, ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে চলে এল। এতক্ষণ ধরে তারই সামনে আশে-পাশে যে নাটকটা ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে কোথাও যেন যোগ ছিল না উজ্জ্বলার—যেন দর্শকের নির্বিকল্প আসনে বসে ছিল সে ; কিন্তু বিনয় ঘরে ঢোকবামাত্র উজ্জ্বলার বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত আছাড় খেয়ে পড়ল, ইচ্ছে হল নিজের গলা দু হাতে টিপে ধরে সে। বিনয় নিষ্ঠুর—কল্পনাতীত ভাবে নিষ্ঠুর ! নইলে আজকের দিনে এই বাড়িতে সে আসতে পারল কী করে !

বিনয়ের মা ডাকলেন, বিনয় !

বিনয় চোখ তুলল। মাত্র কয়েক হাত দূরেই চেলী-চন্দন-মালায় সাজানো প্রতিমার মত বসে আছে উজ্জ্বলা ; কিন্তু বিনয় তা দেখতে পেল না।

বিনয়ের মা বললেন, এমন ফুলের মতো মেয়েটা—তুমি কি চাও ওর এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটে যাক ?

বিনয়ের দৃষ্টি এবার উজ্জ্বলার ওপরে গিয়ে পড়ল। মাথা নীচু করে রইল উজ্জ্বলা, থরথর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট ; কিন্তু বিনয়ের চোখে এক বিন্দু বিস্ময় ফুটল না, এতটুকু কৌতূহলও না। সেই প্রথম দিনে উজ্জ্বলাকে সে যে ভাবে দেখেছিল, আজও তাকালো ঠিক তেমনি ভাবেই।

বিনয় বললে, কী করতে হবে বলো ?

—উজ্জ্বলাকে তুমি বিয়ে করবে। নইলে জাত যাবে ভদ্রলোকের, সর্বনাশ হবে মেয়েটার।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বিনয়। তারপর সহজ গলায় বললে, বেশ। আমিই বিয়ে করব।—ঠিক যেমন করে এক কথায় সে উজ্জ্বলাকে পড়াতে রাজী হয়েছিল, তার সঙ্গে এ গলার কোনো পার্থক্য নেই।

দুর্গেশবাবু বিনয়কে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। কান্নার আকুল গলায় বললেন, বাবা, তুমি আমায় বাঁচালে।

বিনয়ের মা বললেন, আপনি ওই বরকে ফেরত পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন। আমি বিনয়কে সাজিয়ে নিয়ে আসছি। দু ঘণ্টা পরে আবার লগ্ন আছে, সেই লগ্নেই বিয়ে হবে।

ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে গেল সবাই। উজ্জ্বলা আবার একা। খুশি হবে কি-না বুঝতে পারছে না। একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে ; কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত। সানাইয়ে আবার সুর উঠেছে, বাড়িতে আনন্দের সাড়া পড়েছে আবার, বুড়ো বর হয়তো ব্যর্থ-অপমানে মাথা নীচু করে ফিরে গেছে এখন। আশ্চর্য, বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনায় তো বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারছে না উজ্জ্বলা। সেই প্রত্যাখ্যাত অপমানিত মানুষটির কথা ভেবে সমবেদনায় সমস্ত মন তার আকীর্ণ হয়ে গেছে। উপায় থাকলে, শক্তি থাকলে

নিজে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনত উজ্জ্বলা, বলত, তুমিই আমায় নাও, উদ্ধার করো এই অসহ্য যন্ত্রণার পীড়ন থেকে।

হঠাৎ উজ্জ্বলার সমবয়সী তিন-চারটি মেয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। প্রচণ্ড হাসির বেগে ভেঙে পড়ল তারা।

—উঃ, কী চমৎকার নাটকটাই হয়ে গেল রে উজ্জ্বলা!

—আর কী অদ্ভুত ইনোসেণ্ট বিনয়বাবু! পাড়াসুদ্ধ সবাই মিলে প্ল্যান করলে, অথচ বিনয়বাবু তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না।

সন্দেহের আঘাতে উজ্জ্বলা চকিত হয়ে উঠল।

—প্ল্যান? কিসের প্ল্যান?

—তুইও জানিস নে?—আবার কিছুক্ষণ হাসির ঐকতান চলল: তা হলে শুধু তোদের দুজনকেই বোকা বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। শোন্, এ সমস্তই সাজানো। যিনি বর সেজে এসেছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল শাদা পরচুলা, দাঁতে কালি-মাখানো। ভদ্রলোক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেতা। পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গেও আগে থেকেই বন্দোবস্ত ছিল। তোর বাবা, বিনয়বাবুর মা, এ প্ল্যানের মধ্যে সবাই-ই ছিলেন।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

মুহূর্তে মরমে মরে গেল উজ্জ্বলা। শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই তাকে পেতে হল বিনয়কে? এমনি ছলনা দিয়ে, এমনি মিথ্যার ভেতরে? সকলে মিলে একটা হীন চক্রান্ত করে তাকে জড়িয়ে দিলে বিনয়ের জীবনে? এ লজ্জা সে কোথায় রাখবে?

সখীর দল সরে যেতেই আর অপেক্ষা করল না উজ্জ্বলা। আর সময় নেই! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এ গ্লানি, এত বড় অপমান সে সারাজীবন বইবে কী করে? বিনয়কে নিজে সে জয় করতে পারল না—বাঁধতে হল মিথ্যার পাশে? এমন অসম্মান আর পরাজয়ের লজ্জা বয়ে কেমন

করে সে কাটাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ?

তেতলার ছাতের একেবারে অন্ধকার কোণটায় গিয়ে দাঁড়াল উজ্জ্বলা। নীচের আলোকিত পথটা একটা দুর্বার আকর্ষণে তাকে ডাকছে। মৃত্যুর শূন্যতায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শেষবারের মতো উজ্জ্বলা বললে, ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

ইদু মিঞার মোরগা

বৌ জোহরা প্রায়ই ঝগড়া করে।

—ওটাকে এবার বিক্রি করে দাও না। দিব্যি তেল চুক্‌চুকে হয়েছে—গোস্ত হয়েছে অনেক। এখন বেচলে কোন না চারটে টাকাও দাম পাওয়া যাবে ওর!

কিন্তু ইদু মিঞা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, এখন থাক।

—থাক? কেন থাকবে? খাসী মোরগ—গোস্ত খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে তো লাগবে না। মিথ্যে পুষে লাভ কী?

—ওকে পুষতে তোমার কি খুব খরচ হচ্ছে?—ইদু মিঞা কান থেকে একটা বিড়ি নামায়ঃ ঘরের খুদ্‌কুঁড়ো আর আদাড়ে-পাঁদাড়ে যা পায় কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায়। ওর জন্যে তোমার চোখ টাটায় কেন?

জোহরা বলে, এমনি টাটায় না। আর কদিন পরে বুড়ো হয়ে যাবে, পোকা পড়বে গায়ে, শক্ত ছিবড়ে হয়ে যাবে মাংস। আট গণ্ডা পয়সাও কেউ দেবে না তখন।

—দরকার নেই। ও যেমন আছে, তেমনি থাক।

শুনে গা জ্বালা করে জোহরার।

—বেশ তো, বেচো না তুমি। একদিন নিজেই আমি ওটাকে কেটে উনুনে চড়াব।

বিড়িটা ধরাতে ধরাতে শান্ত কঠিন গলায় ইদু মিঞা বলেঃ তা

হলে সেদিনই আমি পাড়া-পড়শী জড়ো করব সমস্ত। তারপর সকলের সামনে চেঁচিয়ে তিনবার বলব ঃ তালাক্—তালাক্—তালাক্—

—এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে! আমার চাইতে ওই খাসী মোরগটাই বড় হল তোমার কাছে!—জোহরার চোখে জল আসে ঃ বেশ, তাই হোক। আমাকে তুমি তালাকই দাও।

জোহরার চোখের জল অনেকবারই অনেক অঘটন ঘটিয়েছে ইদু মিঞার জীবনে। ডাইনে চলতে গিয়ে অনেকবার বাঁয়ে ঘুরেছে—যাদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে চেয়েছিল, আপস করে নিতে হয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে ইদু মিঞা কিছুতেই বশ মানতে রাজী নয়। কী যে টান তার পড়েছে ওই খাসী মোরগটার ওপরে—নিজেও খাবে না, কাউকে বিক্রিও করবে না।

খরিদ্দার এসে হয়তো বলে, কাল দাওয়াত আছে—তোমার খাসী মোরগটা হলে বেশ কুলিয়ে যায়।

—খাসী মোরগটা না হলেও তোমায় কুলিয়ে যাবে মিঞা। আরো দশটা তো রয়েছে—যেটা খুশি বেছে নাও না। ওটা আমি বেচব না।

—বেচবে না? কেন বেচবে না? তিন টাকা দিচ্ছি—

—দশ টাকাতেও বেচব না।

—হঠাৎ এত দরদ কেন? ধর্মব্যাটা নাকি তোমার?

—আমার যাই হোক, তোমার কী?—ইদু মিঞা চটে ওঠে: আমি ওটা বেচব না—এই আমার পাকা কথা। ব্যাস্।

লোক জানাজানি হয়ে গেছে এখন। খাসী মোরগটা ইদু মিঞার ধর্মব্যাটা।

শুধু গজ্ গজ্ করে জোহরা।

—এত হাঁস মুরগী শেয়ালে-ভামে খেয়ে যায়, ওটাকে তো ছোঁয়ও না! ওটা যমের অরুচি!

ইজু মিঞা বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে। একটা কথা গলার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারে না সেটা। কেমন সংকোচ আসে—কেমন মনে হয়, কেউ তাকে বুঝবে না।

সে নিজেই কি বোঝে কেন এমনটা হল ?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মুরগী জবাই দিয়েছে সে। আজো দিতে হয়। কিন্তু মাত্র দুবছর আগে—

বাড়ীতে কুটুম এসেছিল। মুরগী কাটতে হবে। প্রথমেই ইজুর নজর পড়েছিল ওটার দিকে। দিনের বেলা মুরগী ধরা সহজ নয়। পাঁচ ছ'জন মিলে ওটার পেছনে ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। সারা উঠোনময় দৌড়-ঝাঁপ চলতে লাগল। ইজু উঠোনের পেয়ারাতলায় বসে দেখছিল ব্যাপারটা। মোরগটা হয় তো টের পেয়েছিল—যেমন করে সমস্ত প্রাণীই টের পায়। যে কারণে কসাই এসে দড়ি ধরলে গোরু কিছুতেই নড়তে চায় না, যে কারণে ছুরি আনবার আগেই পাঁটা ব্যা ব্যা করতে থাকে—সেই কারণেই ওটা কিছুতেই ধরা দিতে চাইছিল না। তারপর যখন দেখল আর আত্মরক্ষার কোনো আশাই নেই, তখন পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একেবারে ইজু মিঞার কোলের মধ্যে এসে পড়ল।

ইজু তৎক্ষণাৎ ওটার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল হঠাৎ। থর থর করে একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঁপছে মোরগটা—বিচিত্র কাতর প্রার্থনায় তাকাচ্ছে তার দিকে, আর ভয়ার্ত শিশুর মতো আশ্রয় খুঁজছে তার বুকের ভেতরে।

একটা আশ্চর্য করুণায় ইজুর সমস্ত মন ভরে উঠল। মোরগটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, এটা থাক—অন্য মুরগী জবাই হবে আজ।

সেই থেকেই ওটা গোকুলে বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তিতে ইজুর মনে হয়, সংসারে কি একরাশ লকলকে জিভ ছাড়া কিছুই নেই

আর? মানুষ যা দেখে তাই কি খেতে ইচ্ছে করে তার? একটু স্নেহ নেই, একটু করুণা নেই—একবিন্দু সহানুভূতি নেই কোথাও?

বাইরে থেকে কঁক্ কঁক্ আওয়াজ উঠল একটা। তারপরেই ক্যাঁ ক্যাঁ করে কয়েকটা তীব্র আর্তনাদ। সন্দেহ নেই—ওই খাসী মোরগটারই গলা।

ইদু দাঁড়িয়ে উঠল তড়াক করে। একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়। শেয়াল এসে ধরল নাকি দিনের বেলাতেই?

তারপরেই মুরগীর ক্যাঁ ক্যাঁ একটানা আওয়াজ ছাপিয়ে দরাজ গলার হাঁক উঠল: ইদু সেখ আছো নাকি—ও ইদু সেখ?

একটা তীব্র সন্দেহে এক লাফে ইদু মিঞা বেরিয়ে এল বাইরে।

অনুমান নির্ভুল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দবিরুদ্দিন দফাদার। হাঁড়োলের মতো প্রকাণ্ড মুখে চরিতার্থ হাসি। তার হাতের ভেতরে মোরগটা। প্রাণপণে ছটফট করছে আর চিৎকার জুড়ে দিয়েছে তারস্বরে। একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে দবিরুদ্দিন বাঁধছে মোরগের পা দুটো।

ইদু আর্তস্বরে বললে, ওটা ধরেছ কেন দফাদার সাহেব? ছেড়ে দাও ওকে।

দৈত্যের মতো চেহারার দবিরুদ্দিন কাঠচেরার মতো খরখরে আওয়াজ করে হাসল।

—বড় জবরদস্ত মোরগা মিঞা—এমনটি সহজে দেখা যায় না। ধরেছি যখন আর ছাড়ছি না। কত দাম চাও—বলো।

—খোদার কসম—আমি ওটা বেচব না।

দবিরুদ্দিন কথা বাড়াবার দরকার বোধ করল না। খাকী রঙের

সরকারী জামাটার পকেটে হাত দিয়ে দুটো রূপোর টাকা বের করে আনল। তারপর ঠন্ ঠন্ করে ইদুর সামনে ছুড়ে দিয়ে বললে, দেড় টাকার বেশি দাম হয় না—এই নাও, পুরো দুটো টাকাই দিলাম।

ইদু প্রায় হাহাকার করে উঠল।

—ওকে ছেড়ে দাও দফাদার সাহেব, আল্লার দোহাই—ছেড়ে দাও ওকে। আমি কিছুতেই প্রাণে ধরে ওটাকে কাটতে দিতে পারব না।

—শেষে মোরগার ওপর দরদ উথ্‌লে উঠেছে নাকি? সোভান্ আল্লা!—আবার কাঠচেরার মতো কর্‌করে আওয়াজ তুলে হাসল দফাদার। তারপর হাঁটতে শুরু করলে গজেন্দ্র-গমনে—মোরগটার কাতর আর্তনাদ যেন ছুরির পোঁচের মতো ইদুর বুকে এসে বিঁধতে লাগল।

ইদু মিঞা শেষবার অসহায় গলায় ডাকল : দফাদার সাহেব!

দফাদার জবাব দিলে না। দরকারই বোধ করল না আর।

কয়েক মুহূর্ত ইদু দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে—তারপর চুপ করে বসে পড়ল ধুলোর ওপর। চোখের জলে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে—মোরগের কাতর মিনতি এখনো কানে ভেসে আসছে তার।

ছুটে এল জোহরা। আশ্চর্য, মুরগীর ওপরের সমস্ত ক্রোধটা এখন তার দফাদারের ওপর গিয়ে পড়েছে।

—জোর করে কেড়ে নিয়ে গেল? একি জুলুমবাজি?—আকাশের দিকে হাত তুলে জোহরা বললে, ওই মোরগ কক্ষণো ও খেতে পারবে না। খোদা আছেন—তিনিই বিচার করবেন।

গরীবের প্রার্থনা খোদা কখনো শুনতে পান না—তিনি হাইকোর্টের জজের মতো। উকিল-ব্যারিস্টারকে বিস্তর টাকা খাওয়াতে পারলে, অর্থাৎ মোল্লা-মৌলবীদের জুৎ মতো ভেট

যোগাতে পারলে তবেই আরজি পেশ করা যায় তাঁর দরবারে। সবাই একথা জানে, দবিরুদ্দিন দফাদারও জানত। কিন্তু আজ বোধ হয় তিনি বোগদাদের বাদশা হারুণ-অল-রশীদের মতো ছদ্মবেশে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাই জোহরার প্রার্থনা তিনি শুনতে পেলেন। মোরগটা সত্যিই দবিরুদ্দিনের ভোগে লাগল না।

খানিক দূর হাঁটতেই দেখা হয়ে গেল দীন মহম্মদ দারোগার সঙ্গে। একটা সাইকেলে করে তিনি থানার দিকে ফিরছিলেন। অভ্যাসবশে দাঁড়িয়ে পড়ল দফাদার—সজোরে সেলাম ঠুকল একটা।

দারোগা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঝাঁ করে নেমে পড়লেন হঠাৎ। তাঁর চোখ মোরগের দিকে গিয়ে পড়েছে।

—খাসা মোরগাটা তো দফাদার! কিনলে নাকি?

মুহূর্তে দফাদারের বুক শুকিয়ে গেল।

—জী হুজুর, কিনলাম বৈকি। বিনি পয়সায় আমাদের আর কে দিচ্ছে এসব?

—বড় ভালো চিজ্, আজকাল এমনটি আর দেখাই যায় না।—দারোগা ঠোঁট চাটলেন।

—জী হাঁ।—সন্ত্রস্ত গলায় দফাদার জবাব দিলে।

দারোগা আর একবার মোরগটার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন মোটা মোটা পা দুটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ওটা হাঁড়ি-কাবাবে পরিণত হয়ে গেল। রশুন, ঘি আর মসলা-জর্জরিত বাদামী রঙের হাঁড়ি-কাবাবটি যেন একেবারে দারোগার নাকের সামনেই দুলতে লাগল। আর ওই সঙ্গে যদি পোলাও হয়—

এরপরে আর চক্ষুলজ্জার আবরণ রাখলেন না দারোগা।

—দাও হে দফাদার, ওটা আমার সাইকেলেই বেঁধে দাও।

দবিরুদ্দিন মুখ কালো করে বললে, কিন্তু হুজুর—

দারোগা সংক্ষেপে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আর একটা কিনে নিয়ো। কত দিতে হবে দাম ?

ক্রোধে, হতাশায় দবিরুদ্দিনের চোখ ধক্‌ধক্ করে উঠল। মুখের গ্রাস যখন কেড়ে খাবেই, তখন কিসের এত খাতির ?

দবিরুদ্দিন শুকনো গলায় বললে, তিন টাকা দেবেন হুজুর।

—তিন টাকা ?—চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দারোগা। তিনটে টাকার জন্যে নয়—আশ্চর্য হয়ে গেছেন দবিরুদ্দিনের দুঃসাহস দেখে। কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে এ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম। তাঁরই দফাদার একটা মুরগীর দাম দাবি করে তাঁর কাছ থেকে !

পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে দারোগা ছুড়িয়ে দিলেন রাস্তার ওপর। দবিরুদ্দিন ইতু মিঞা নয়—সঙ্গে সঙ্গে টাকা তিনটে কুড়িয়ে নিলে সে।

দারোগা মনে মনে বললেন, আচ্ছা, থাকো। এই তিন টাকার শোধ আমি তুলে নেব।

সাইকেলে মোরগটা ঝুলিয়ে দারোগা চললেন। সেই অবস্থাতেই একবার টিপে দেখলেন মোরগটা—একেবারে সীসের মতো ঠাসা। মোরগ আবার ক্যাঁক-ক্যাঁক্ শব্দে আর্তনাদ তুলল—দারোগার কানে শব্দটা যেন মধু বর্ষণ করতে লাগল। না—ঠকা হয়নি তিন টাকায়।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্যাডল্ করে চললেন দারোগা। বড় বিবি খানদানি ঘরের মেয়ে – ওদের কোন্ পূর্বপুরুষ নাকি মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজেদ আলীর খাস বাবুর্চি ছিল। সেই পূর্বপুরুষের গুণপণা বড়বিবির মধ্যে এসেও বর্তেছে।

চমৎকার রান্নার হাত বড় বিবির। খেতেও হয় না—সে রান্নার খোশবুতেই মেজাজ খোশ হয়ে যায়।

যেন অদৃশ্য সূতোয় বাঁধা হাঁড়ি-কাবাবটা নাকের সামনে দুলছে এখনো। দারোগা গুন্ গুন্ করে 'মোহব্বত-এ-দিল্' ছবির একখানা গান গাইতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু থানার কম্পাউণ্ডে ঢুকেই চক্ষুঃস্থির। বারান্দায় একখানা চেয়ার টেনে বসে আছেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার ইমতিয়াজ চৌধুরী। জমাদার জামান মিঞা পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ইন্‌স্‌পেক্‌টারের আরদালী আবদুল প্রায় কাঁদি খানেক ডাব নিয়ে কাটতে বসেছে!

দারোগা দীন মহম্মদ ট্যারা হয়ে গেলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌টার ইমতিয়াজ চৌধুরী অত্যন্ত প্যাঁচালো লোক—মহকুমার একটি দারোগাও তাঁর জ্বালায় স্বস্তিতে থাকতে পারে না। তার ওপর দীন মহম্মদকে তিনি মোটেই নেক-নজরে দেখেন না—ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাতদিন।

বারান্দায় সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে শশব্যস্তে দারোগা ওপরে ওঠে এলেন।

—আদাব স্যার, কতক্ষণ এসেছেন?

ইন্‌স্‌পেক্‌টার তখন কুঁজোর মতো প্রকাণ্ড একটা ডাব ধরেছেন মুখের কাছে। গলার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছে গব্ গব্ করে! ডাবটা নিঃশেষ করে ইন্‌স্‌পেক্‌টার সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন, মুখ মুছলেন রুমালে, একটা ঢেঁকুর তুললেন, তারপর গোটা কয়েক নিঃশ্বাস ফেললেন বড় বড়। নাক থেকে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেমন যেন শব্দ বেরিয়ে এল খানিকটা।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, এই কিছুক্ষণ হল এসেছি। সাপুইহাটির

ডাকাতি কেস্‌টা নিয়ে একটু দরকারী আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে। তা ছাড়া ইনস্‌পেক্‌শনও করব।

মনে মনে একটা অশ্রাব্য গালাগালি উচ্চারণ করলেন দারোগা।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন আমার সময় বেশিক্ষণ নেই। জীপ্‌ নিয়ে এসেছি, একটু পরেই আমি সদরে ফিরে যাব। অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম, ভাবলাম আপনার এখানেও একটু ঘুরে যাই।

কৃতার্থ ভঙ্গিতে দীন মহম্মদ বললেন, বেশ করেছেন স্যার, ভালোই করেছেন। তা হলে আমার ওখানে খানাপিনার একটু বন্দোবস্ত করি?—মনে মনে বললেন, তুমি না সরে পড়া পর্যন্ত মোরগাটা আমি জবাই করছি না। তোমার খাওয়া তো আমি জানি—আমাদের জন্যে হাড় ক'খানাও পড়ে থাকবে না তা হলে। চিবিয়ে তা-ও তুমি ছিবড়ে করে দেবে!

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, না—না, আমি খেয়েই এসেছি। আমার জন্যে ভাববেন না।

দারোগা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যা হবে এতো জানা কথা!

অতএব পরক্ষণেই ইমতিয়াজ চৌধুরীর চোখ গিয়ে পড়ল সাইকেলে বাঁধা মোরগাটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর দৃষ্টি!

—বাঃ—বাঃ, দিব্যি চিজটি তো! কোথায় পেলেন?

দারোগার হৃৎপিণ্ড ধড়াস্‌ করে লাফিয়ে উঠল। বিরস মুখে বললেন, কিসের কথা বলছেন স্যার?

—ওই মোরগাটা। বহুদিন এমন জিনিস চোখেও দেখিনি।

দারোগা আর্ত হয়ে উঠলেন।

—ও বিশেষ কিছু নয় স্যার। ওর চাইতে ঢের ভালো মোরগা শহরে পাওয়া যায়।

—ক্ষেপেছেন আপনি ?—ইন্‌স্‌পেক্‌টার উবু হয়ে বসলেন : শহরের মোরগায় কি আর বস্তু আছে নাকি ? খালি হাড় আর হাড়—মনে হয় যেন মাছের কাঁটা চিবুচ্ছি। এ সব জিনিস শুধু পাড়াগাঁয়েই পাওয়া যায়। তাজা জল-হাওয়ায় তেলে-মাংসে জবজবে হয়ে ওঠে।

ইন্‌স্‌পেক্‌টারের জিভে সুড়ুৎ করে শব্দ হল একটা ; খানিক লালা টানলেন খুব সম্ভব।

দারোগা কাষ্ঠহাসি হাসলেন : বেশ তো স্যার—পরে দু'চারটে পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

—পরের কথা পরে হবে !—ইন্‌স্‌পেক্‌টার আর মোরগটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না : এটার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। আবদুল, যা তো মোরগাটাকে জীপে তুলে নে।

চড়াৎ করে বুকের একটা শিরা যেন ছিঁড়ে গেল দারোগার।

—আমি বলছিলাম কি স্যার—

—আরে মিঞা সায়েব, আপনারা পাড়াগাঁয়ে থাকেন, ও-রকম মোরগা বিস্তর পাবেন। আবদুল, যা—ওটাকে জীপে তুলে দে চট্‌পট্‌। ভালো কথা, কত দিয়ে কিনেছেন মোরগা ?

শেষ কথাটা বলবার জন্যেই বলেছিলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার—নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই বলা। নইলে একটা মুরগী দিয়ে দারোগা ইন্‌স্‌পেক্‌টারের কাছ থেকে দাম নিতে পারে—কে কল্পনা করবে সে কথা ?

মনে মনে দাড়ি ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল দারোগার। নিজের নয়—ইন্‌স্‌পেকটারেরও।

সদয় হাসিতে ইন্‌স্‌পেক্‌টার আবার বললেন, কত দাম ওটার ?—এই বলে যে-পকেটে তিনি হাত ঢোকালেন সেখানে টাকা ছিল না।

কিন্তু বজ্রাঘাত হল বিনা মেঘেই ।

নিরুপায় ক্রোধে জর্জরিত হয়ে কালো মুখে দারোগা বললেন, তা হলে চারটে টাকাই দেবেন স্যার।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। জমাদার জামান খাঁ নড়ে উঠলেন, ডাব কাটতে গিয়েই দায়ের কোপটা আর একটু হলে প্রায় আবদুলের হাতে গিয়ে পড়ত। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

দারোগা মরিয়া হয়ে বললেন, দাম একটু বেশিই স্যার। পুরো দেড় সের গোস্ত হবে—দু' এক ছটাক বেশি বই তো কম নয় !

অদ্ভুত প্রশান্ত হাসি হাসলেন ইম্‌তিয়াজ চৌধুরী।

—তা বটে। ভালো জিনিস হলে দাম একটু চড়াই হয়। এই নিন্—এবার আর একটা পকেট থেকে দু'খানা দু'টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখলেন : এই নিন্। আবদুল—

—যাতে হেঁ হুজুর—

আবদুল মোরগাটাকে খুলে নিলে সাইকেল থেকে। আর একবার কঁক্-কঁক্-ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল একটা। দারোগা মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, তা হলে এবার আপনার ডাইরি-টাইরি-গুলো নিয়ে আসুন দারোগা সাহেব। হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

—ভাগ্‌তা হ্যায় হুজুর, ভাগ যা-তা—আবদুল চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেও রাখা গেল না। আবদুলের প্রসারিত হাতে গোটা কয়েক নখের আঁচড় দিয়ে পাখা ঝাপ্‌টে চলন্ত জীপ থেকে বাইরে উড়ে পড়ল মোরগটা। দবিরুদ্দিনের আলগা ফাঁস কখন খুলে গিয়েছিল কে জানে !

—থামা, গাড়ী থামা !—ইম্‌তিয়াজ চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠলেন।

গাড়ি ঘ্রাস্‌-স করে থেমে গেল। ছরাৎ ছরাৎ করে একরাশ কাদা ছিট্‌কে পড়ল চারদিকে।

মোরগ তখন উর্ধ্বশ্বাসে ক্যাঁক্‌ ক্যাঁক্‌ করে একটা কচুবনের দিকে ছুটেছে। 'পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো' বলে উত্তেজনায় ইন্‌স্‌পেক্‌টার নিজেই লাফিয়ে পড়লেন নিচে।

কিন্তু পায়ের নিচে এঁটেল মাটির কাদা। লাফিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সড়াক্‌ করে হাত তিনেক পিছলে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার, তারপর নাচের ভঙ্গিতে বোঁ করে একটা পাক খেলেন, তারও পরে একখানা মোক্ষম আছাড়—একেবারে সোজা চলে গেলেন লাটাবনের ভেতরে।

আবদুল আর ড্রাইভার ছুটেছিল মোরগের পেছনে—দৌড়ে ফিরে এল তারা। ইন্‌স্‌পেক্‌টার তখন আর উঠতে পারছেন না—একটা হাঁটুতে বোধ হয় ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। লাটাবনের কাঁটায় গাল-কপাল ক্ষত-বিক্ষত !

ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে যখন জীপে তোলা হল, তখন আর পলাতক মোরগাকে খুঁজে বের করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। খোঁজবার মতো কারো মনের অবস্থাও নয়।

সন্ধ্যা নামছিল আস্তে আস্তে। ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসেছিল ইদু মিঞা। মোরগার শোক এখনও তার বুকে পুত্রশোকের কাঁটার মতো বিঁধছে। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে শোনা গেল : কঁরুর্‌—কোঁকোর—কোঁ—

ইদু মিঞা চমকে উঠল। সেই ডাক। ভুল শুনছে না তো ? নাকি মোরগটার প্রেতাত্মা মায়ার টানে শূন্য থেকে জানান দিয়ে গেল ?

আবার সেই ডাক ঃ কঁক্—কঁক্—কোঁকর-কোঁ-ওঁ-ওঁ—

উঠোন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জোহরা ঃ সাহেব, তোমার মোরগ ফিরে এসেছে! বসে আছে চালের ওপর!

ইত্নু লাফিয়ে নেমে পড়ল উঠোনে। সত্যিই ফিরে এসেছে! গাঁয়ের মোরগ—বহু দূর পর্যন্ত চরে বেড়ায়—মাইল খানেক রাস্তা চিনে আসতে খুব অসুবিধে হয়নি তার।

চালের ওপর বসে তৃতীয়বার মোরগ জয়ধ্বনি করল। তারপর ঝট্‌পট করে উড়ে পড়ল উঠোনে—বিজয়ী সম্রাটের মতো মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল নিজের খোঁয়াড়ের দিকে।

আরো তিনটে ছোট ছোট ঘটনা ঘটল তারপরে।

কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার জন্যে একমাস পরে দারোগার রিপোর্টে দবিরুদ্দিন দফাদারের চাকরি গেল।

প্রায় দেড় মাস পরে ভাঙা হাঁটুতে জোড় লাগল ইন্‌স্‌পেক্‌টার ইম্‌তিয়াজ চৌধুরীর।

আরো তিন মাস পর সাপুইহাটি ডাকাতির ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাস্‌পেণ্ড হয়ে গেলেন দারোগা দীন মহম্মদ।

হরিণের রঙ

পর পর দুটো দিন খুব খারাপ গেছে। কী যে হয়েছে, ও ভালো করে মনেও আনতে পারেনা। কখনো কার একটা হিমের মতো ঠাণ্ডা হাত হৃৎপিণ্ডের কাছে উঠে এসেছে—চেপে ধরতে চেয়েছে বজ্রমুঠিতে। কখনো বা চোখের সামনে নিবিড় কুয়াশার মতো ধোঁয়া এসে জমেছে। সে-ধোঁয়া পাথরের মতো ঘন হয়েছে ক্রমশ—শ্বাস টানতে পারেনি ভালো করে, অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে মনে হয়েছে সাপের মতো কী যেন পাক দিয়ে দিয়ে ধরছে ওর গলায়। আবার কখনো বোধ হয়েছে যেন আশ্চর্য লঘু হয়ে গেছে ওর শরীর—পাখির একটা পালকের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে ও। ঠিক মেঘের মতো। অনেক—অনেক নীচে দীর্ঘ ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে অজস্র হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। একটা—দুটো—একশো—এক হাজার—

অসংখ্য হরিণের গায়ে সেই লক্ষ লক্ষ বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও একটা বিন্দুর মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর সেই বিন্দুটা চৈতন্যের একটা বৃত্তের রূপ নিল; এক টুকরো মন ক্রমে ক্রমে সজাগ হয়ে উঠল যন্ত্রণাভরা একটা শরীরে। মাথায় পাথরের ভার, হাত-পাগুলো অবশ, বুকের ভিতর থেকে-থেকে অসহ্য বেদনায় উৎক্ষেপ !

ক্রাইসিস্ কেটেছে একটা। মেঘ নেমেছে মাটিতে। ফিরে এসেছে শরীর—সেই সঙ্গে এসেছে ফিডিং কাপ, এসেছে ওষুধের শিশি, এসেছে থার্মোমিটার, পান্নার রঙের একগুচ্ছ আঙুর—কমল-হীরের মতো আধভাঙা বেদানার দানা। ঘরের ওই যে কোণাটায় আবছা অন্ধকারের ভেতর ছায়া-ছায়া দু' তিনজন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছিল, তারা 'মথ্' হয়ে বাইরের রাত্রির আড়ালে মিলিয়ে গেছে ; এখন ওখানে কাশ্মীরী টিপয়ের উপর সেই পুরোনো পরিচিত রেডিয়োটা মৃদু গুঞ্জন করছে—জ্বলজ্বল করছে তার সবুজ 'ম্যাজিক আই'।

এই কি ভালো হল ? এম্‌নি করে ফিরে আসা ? কত বড় মাঠ—সবুজের কী অন্তহীন তরঙ্গ। কত অসংখ্য হরিণ—তাদের গা থেকে লাল-শাদা রঙগুলো যেন একরাশ বলের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। ওরও সমস্ত মন যেন ওই বলগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল—হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গিয়েও হারিয়ে যাচ্ছিল বার বার।

বেশ লাগছিল খেলাটা। তবু শরীরের ভেতরে ফিরে আসতে হল।

—আমায় একবার ধরবি নন্দা ?

এই সকাল বেলাতেই নন্দা কয়েকটা ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ঘরে। চমকে ফিরে তাকালো।

—একটু বারান্দায় নিয়ে চল নন্দা। ঘরে শুয়ে শুয়ে আর তো ভালো লাগছে না।

ও জানত, নন্দা কিছুতেই রাজী হবে না। আলতো ধমক দিয়ে বলবে, কী পাগলামী করছ বৌদি। ডাক্তার তোমাকে নড়তে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে !—জেনেই ও বলেছিল কথাটা। বলেছিল দু দিন পরে নিজের কথা নিজের কানে শোনবার জন্যেই।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ তো নন্দা রেগে উঠল না। ভারী নরম, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, কিন্তু তুমি তো উঠে যেতে পারবেনা বৌদি। ভারী কষ্ট হবে তোমার।

—কিচ্ছু কষ্ট হবেনা।—ও হাসল। একবারের জন্যে মনে হল, একখানা আয়না সামনে পেলে দেখত নিজের হাসিটা আজও আগের মতো আছে কিনা। যা দেখেই নাকি বিশেষ করে অনিল ওর প্রেমে পড়েছিল সে হাসি এখনো একটুখানি জড়িয়ে আছে কিনা ওর ঠোঁটের কোনায়।

—একটু হাতটা ধর নন্দা, তা হলেই আমি ঠিক উঠে যেতে পারব। আজ ভালো আছি—সব অসুখ সেরে গেছে আমার। ও আবার হাসল। ইচ্ছে করল ছোট আয়নাটা চায় নন্দার কাছে, কিন্তু কেমন বাধো-বাধো ঠেকল।

নন্দা কাছে এগিয়ে এল। কোনো কথা বললে না, আস্তে আস্তে ধরে বাইরে নিয়ে এল। ঘর থেকে বারান্দার পথ হাত দশেকের বেশী না। তবু মনে হচ্ছিল, ও যেন অনেকদিন ধরে অনেক পাহাড় পার হয়ে চলেছে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না—আজ ছ মাস পরে শরীরটা অদ্ভুত লঘু হয়ে গেছে ওর। নন্দা এখন ওর হাত ছেড়ে দিলেই ও যেন মাটি ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে—পেরিয়ে যেতে পারবে সামনের বাগানটা, লাল মাটির পথটুকু, দূরের শালবন, পাহাড়ের টিলাটা, রূপনারায়ণপুরের স্টেশন—তারপর—

বারান্দায় বড় ডেক-চেয়ারটায় শুইয়ে দিলে ওকে। পাখির ছানা রেখে দেওয়ার মতো সতর্ক কোমল ভঙ্গিতে ঠিক করে দিলে মাথাটা। দুধের ফেনার মতো শাদা শালটাকে সযত্নে বিছিয়ে দিলে শরীরের উপর। তারপর একটু দূরে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে রইল তন্ময় হয়ে।

নন্দার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ওর কষ্ট হচ্ছিল—তাই সামনের দিকে চোখ মেলে দিলে। মগ্ন-চৈতন্যের সেই প্রখর উজ্জ্বল রোদটা নয়—বাগান, লাল মাটির পথ আর শালবনের ওপরে আধ-পাকা কমলা লেবুর রঙ ঝিল্‌মিল্‌ করছে। শরতের রোদ। কাছাকাছি কোনো নদী থাকলে তার বালিডাঙায় কত কাশফুল দেখা যেত এখন।

ইটের কেয়ারির ভিতরে দুটো একটা সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার মুখ খুলছে। কয়েকটা দোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার মঞ্জরী প্রায় জড়াজড়ি করে হাওয়ায় কাঁপছে। বাঁ-দিকের শাদা হয়ে যাওয়া শিউলিতলা থেকে পচা ফুলের কেমন একটা অস্বস্তিকর গন্ধ ভেসে আসছে ঝলকে ঝলকে।

—তোর দাদা কোথায় নন্দা?—ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কষ্ট হয়, তাই সামনের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

—কিছু বলছিলে বৌদি?—যেন স্বপ্ন থেকে নন্দা জেগে উঠেছে।

—এই সকালে তোর দাদা আবার গেল কোথায়?

—রজতদা—মানে ডাক্তারবাবুর ওখানে!

রজতদা—মানে ডাক্তারবাবু! কি রকম সামলে নিয়েছে নন্দা! কিন্তু একটুখানি ঠাট্টা করতেও ইচ্ছে হয়না মেয়েটাকে। ভারী ভীতু—ভারী কোমল। ফুলের উপর শিশিরের মতো চোখ দুটো জলে যেন টলটল করছে—সামান্য ছোঁয়া লাগলেই টুপ্‌ টুপ করে গড়িয়ে পড়বে।

ওকে বিয়ে করলে সুখীই হবে রজত। যে-কেউ সুখী হবে। অবশ্য গায়ের ফর্সা রঙটাকেই যারা বড় করে দেখে তাদের কথা আলাদা।

একটু কষ্ট হল, তবু নন্দার দিকে মাথা ঘুরিয়ে একবারটি তাকিয়ে

দেখবার লোভ ও সামলাতে পারল না। তেমনি তন্ময় হয়ে বসে আছে নন্দা। শালবনটা দেখছে? দেখছে পাহাড়টাকে? নাকি রজতকে ভাবছে—রজতের কথাই ভাবছে শুধু?

—আবার এই সকাল বেলাতেই রজতবাবুকে বিরক্ত করা কেন?—নন্দার কালো বিনুনিতে লাল ফিতের ফাঁসটা দেখতে দেখতে ও বললে, আমি খুব ভালো আছি আজ। মনে হচ্ছে, একেবারেই সেরে গেছি।

নন্দা এবার ওর দিকে চোখ ফেরাল। সেই টলটলে চোখ। আজকে যেন আরো বেশি চকচক করছে। মনে হচ্ছে কেবল কয়েক ফোঁটা জলই নয়—ও দুটোই কখন ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়তে পারে।

নন্দার ঠোঁট দুটো খুব অল্প অল্প নড়ে উঠল, যেমন করে মৌমাছির ডানার হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি নড়ে ওঠে। আবার নিঃশব্দ স্বর ভেসে এল: আজ আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না বৌদি?

—কিচ্ছু না। একেবারেই নয়।—পুরো ছ'মাস পরে আজ ও সম্পূর্ণভাবে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, একটা ছোট্ট কাঁটাও খচ্‌খচ্‌ করল না কোনোখানে।

—এতো খুব ভাল কথা বৌদি।

—ভালো কথা আর কী করে হল?—ওর মনের অপরিমিত খুশিটা কমলা রঙের রোদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল: আবার তো তোর দাদাকে বকাবকি করব। মার্কেটিঙে নিয়ে যাবার জন্যে বিরক্ত করে মারব। তার চেয়ে আমি মরে গেলেই ভালো হত। তোর দাদা বেশ শান্তশিষ্ট মনের মতো একটি বউ ঘরে আনত—সাত চড়েও একটি রা ফুটত না যার মুখ দিয়ে। না রে?

—কী যে বলছ বৌদি!—অভ্যাসবশে আজও প্রতিবাদ করল নন্দা; কিন্তু সে রাগের ভঙ্গিটা নেই কোথাও—কেমন ভিজে ভিজে গলার স্বর। রজতের কথা ভাবছে নন্দা?

—কিন্তু আমি মরব না। দু'দিনের ধাক্কা যখন সামলে উঠেছি—আর মরব না। দেখিস, এক মাসের মধ্যেই আবার আগেকার শরীর ফিরে পাব আমি—আবার ব্যাড্‌মিণ্টন খেলব তোদের সঙ্গে। তোর দাদার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। দিব্যি আর একটা বিয়ে করার চান্স পাচ্ছিলেন—একটুর জন্যে ফসকে গেল।

—এত কথা বলছ বৌদি—তোমার ক্ষতি হতে পারে।

—ক্ষতি হবে কিরে? দেখছিস না, এক ফোঁটা জ্বর নেই আজ? শরীরটা কেমন হালকা হয়ে গেছে। আজ কিন্তু দুটি ভাত খাব আমি, বলে দিস্ ঠাকুরকে।

—বেশ তো, দাদা ওঁরা আসুন। যদি বলেন—নন্দার ঝাপ্‌সা স্বর ভেসে এল।

—ওঁরা আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?—নিজের মনেই ও কথা কইতে লাগল। বাগানের ফুলগুলো, শালবনের ভিতর দিয়ে লাল মাটির পথ—দূরের পাহাড়টা—শরতের ঝিলমিলে রোদ-মাখানো এদের সকলের সঙ্গেই কথা কইতে লাগল ও। নন্দা সামনে না থাকলেও চলত এখন।

—এখন ভালো হয়ে উঠতেই হবে আমাকে: পৃথিবীর ঘনগন্ধ, বাগানের মাটিতে অভ্রের ঝিকিমিকি, পাশাপাশি সই-পাতানো দোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার দোলা ওর রক্তে রিন্‌রিন্ করতে লাগল: ইস্—এই ছ'টা মাস কী ভাবে কেটেছে! কিছু দেখতে পারিনি—একটা কাজ করতে পারিনি বাড়ির। মণ্টু আর খোকন একেবারে পড়াশুনো করেনি, ঝি-টা ডজন ধরে কাচের গেলাস আর চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে, তোর দাদা ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে হোটেলে-রেস্তোরাঁয় যা-খুশি খেয়ে বেড়িয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে—আবার গুছিয়ে নিতে হবে সমস্ত। কত কাজ—কত কাজ আমার!

কেন ছট্‌ফট্‌ করে উঠল নন্দা ? কেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ? ওর ভালো লাগছে না ? রজতের কথা ভাবছিল—ওকি তাতে বাধা দিচ্ছে বারে বারে ? একটুখানি লজ্জিত হয়ে ও চুপ করল। নন্দা আস্তে আস্তে নেমে গেল বারান্দা থেকে—শিউলি গাছটার পাশে একরাশ বিবর্ণ ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

ও নন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। নন্দাকে দেখতে পাচ্ছেনা, দেখছে সাত বছর আগেকার নিজেকে—যখন ওর বয়েস ছিল সতেরো, যখন ও থার্ড ইয়ারে পড়ত। অনিল এসে দাদার সঙ্গে গল্প করে চলে যাওয়ার পর এমনিভাবে ও-ও এসে বসত শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়ির দোতলার বারান্দায়—নিজের মধ্যে মন ডুবিয়ে চেয়ে থাকত খানিকটা সবুজ পোড়ো জমি আর টালির বস্তির দিকে। অনিলকে ভাবতে চাইত, কিন্তু আশ্চর্য—অনিলের মুখখানা কিছুতেই ওর মনে আসত না। খালি চোখের উপর ভেসে উঠত, সিউড়ীতে ময়ূরাক্ষীর ধারে বৃষ্টি থেমে যাওয়া শীতল একটা শান্ত গোধূলি, তালবনের উপর নিখুঁত একটা সম্পূর্ণ রামধনু। অতবড় রামধনু জীবনে ও কোনোদিন দেখেনি।

নন্দা কি ভাবতে পারছে রজতের মুখ ? কিংবা ভাবছে শেষ রাত্রের কোনো গ্যাস্‌ পোস্টের স্তিমিত আলোটার কথা ? কিংবা গিরিডির সেই মহুয়া গাছটার এক ঝাঁক হরিয়াল ? কিংবা ?

খুব ভালো হবে রজতের সঙ্গে নন্দার বিয়ে হলে। খুব খুশি হবে ও। কতদিন বিয়ে হয়নি বাড়িতে। সানাইয়ের সুর—নানা রঙের শাড়ি—হাসি, গান, কোলাহল, চারদিকের জোরালো আলো-গুলোতে পর্যন্ত চেলী চন্দনের রঙ। কতদিন দেখেনি। সেই বিয়ের দিনে আবার পাঁচ বছর পরে ও বেনারসী পরবে এক-খানা ; ফুলশয্যার রাত্রে যে গন্ধের শিশিটা উজাড় করে ঢেলে

দেওয়া হয়েছিল ওর শাড়িতে, ওদের বিছানায়, আবার তাই একটু মেখে নেবে নতুন করে। নন্দার এই রাতটির মধুচক্র থেকে ও-ও চুরি করে নেবে একটুখানি, সংগ্রহ করে রাখবে এক ছড়া মালা আর একটুখানি চন্দন; নিরিবিলি সুযোগ পেলেই সেই চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেবে অনিলের কপালে, মালাটা দুলিয়ে দেবে গলায়। অনিল আশ্চর্য হয়ে একটাও কথা বলবার আগেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে পালিয়ে যাবে সামনে থেকে—পাঁচ বছর আগে যেমন করে পালিয়ে যেত।

কল্পনাটা ওর মনে একটু একটু করে নেশার মতো ঘনিয়ে আসতে লাগল। আবার একটা হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। দেড় মাস আগে যখন ওকে হাসপাতাল থেকে অনিল নিয়ে এল—সেদিন কেউ কোনো কথা বলেনি; কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল—বুঝতে পেরেছিল সকলের মেঘলা মুখের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়েছে। আমাদের আর কিছু করবার নেই—এখন তোমাদের মধ্যে গিয়েই শেষের ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিক। আর সেই শান্তিতে যাতে এতটুকুও ব্যাঘাত না হয় সেই জন্যেই অনিল ওকে এখানে নিয়ে এসেছে—এই শালবনে, লাল মাটির এই পথের ধারে, আধ-পাকা কমলা লেবুর মতো এই ঘুম্-ঘুম্ রোদের ভেতরে।

গত দু দিন ধরে সেই ছুটির ডাক ও শুনেছিল। গলার ওপরে সাপের বেড়ীর মতো কী একটা পাক দিয়ে দিয়ে ধরছিল বার বার। ঘরের কোণে সেখানে পরিচিত রেডিয়োটার 'ম্যাজিক আই' জ্বলছে, ওখানে দাঁড়িয়ে শাদা-শাদা দু' তিনজন কী যেন আলোচনা করছিল ফিস্‌ফিস্ গলায়। আর ছিল সীমানাহীন একটা মাঠের ভিতর অসংখ্য অগণিত হরিণের রঙ—একরাশ রঙিন বলের মধ্যে নিজেকে ও খুঁজে ফিরছিল, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই।

কিন্তু সে-ঘোর ওর কেটে গেছে। যে-শরীরটাকে ফেলে ও

চলে যেতে চাইছিল—এখন সেই শরীরটাকেই গভীর মমতার সঙ্গে ও জড়িয়ে থাকতে চাইছে। নিজের শুভ্র শীর্ণ ডান হাতখানা ও চোখের সামনে তুলে ধরল। আঙুলগুলো যেন হাতীর দাঁত দিয়ে গড়া—বিবর্ণ নীরক্ততার ওপরে আংটির চুনীটা জমাট রক্তের মতো টক টক করছে। তবু হাতখানাকে ওর ভালো লাগল—ভালো লাগল সমস্ত শরীরটাকে—ভালো লাগল আলো-গন্ধ-মাটির মধ্যে এমনি নিবিড় হয়ে বসে থাকতে।

—আর ভয় নেই, এবার আমি বাঁচব। আর আমি মরব না।—হাতখানাকে ও বুকের উপর নামিয়ে আনল, অনুভব করতে চাইল নিজের জীবনের স্পন্দন। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে—বেঁচে থাকার কথা ভাবতেও আশ্চর্য আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার মন। মাত্র চব্বিশ বছর আমার বয়েস—এখনো কোনো কিছু আমার শুরুই করা হয় নি। খুব ভালো আছি আজ—ছ' মাসের মধ্যে এত ভালো কখনো থাকিনি। এখন আমি অনেকদিন বাঁচব।

হ্যাঁ। নন্দার বিয়ের দিনে। সেই দিনই আরম্ভ করতে হবে আবার। হঠাৎ কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে গলায় মালা দুলিয়ে দিলে কি রকম হবে অনিলের মুখের চেহারা? কৌতুকভরা সুখের আবেশে ওর মন ডুবে যেতে লাগল। কোন্ শাড়িটা পরব? ওই আকাশের মতো মৃদু নীল যার রঙ? কিংবা লাল মাটির পথটার লাল আভা দিয়ে যেটা জড়ানো? কোনটা পরব আমি—কোন্‌খানা?

আসন্ন সানাইয়ের সুরে, আগামী সুগন্ধের রোমাঞ্চে, ভালো হয়ে—সম্পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দে ও এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেল যে টেরই পেল না কখন গেট দিয়ে ঢুকল অনিল আর ছোকরা ডাক্তার রজত। দেখতেই পেল না কখন নন্দার ভীতি-

ব্যাকুল মুখের ওপরেও একটুখানি লজ্জার আভাস দোল খেয়ে উঠল। এমনকি অনিল আর রজত যখন ওর পাশে এসে দাঁড়াল, রক্তবিন্দুর মতো চুনীর আংটিপরা শীর্ণ শুভ্র হাতখানা রজত তুলে ধরে যখন পরীক্ষা করতে লাগল—তখনো না—তখনো ওর ঘোর ভাঙল না। তাকিয়েও দেখল না বারান্দার কোণায় কখন অনিলকে ডেকে নিয়ে গেল রজত।

—আপনার মা-কে এখুনি টেলিগ্রাম করে দিন্ অনিলদা। আর দেরি করবেন না—

—কিন্তু আশ্চর্য ভালো ছিল সকাল থেকে—একটুও কষ্ট ছিল না—সব জেনে, সব বুঝেও বলতে চাইল অনিল। রজতকে নয়—যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল শেষ চেষ্টায়।

—'টি-বি'র লাস্ট স্টেজে ওটা জীবনের আলেয়া অনিলদা। রাতটাও বোধ হয় কাটবে না!

অনিল জানে—রজতের চেয়ে বেশি করেই জানে। তৈরিও হচ্ছিল একটু-একটু করেই। তবু পাংশু হয়ে গেল মুখ। নন্দার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল না—কেবল শরীরটাকে এলিয়ে দিলে থামের গায়ে, নইলে হয়তো মাটিতেই লুটিয়ে পড়ত।

—আপনি থাকুন, আমিই বরং টেলিগ্রামটা করে আসছি—রজত বলল।

কিন্তু ও তখনো স্বপ্ন দেখছিল। আর নিজের অজ্ঞাতেই আস্তে আস্তে আকাশ-মাটি-রোদ-শাড়ি আর সানাইয়ের সুর কখন মুছে যাচ্ছিল একটু-একটু করে।

আবার সেই মেঘ হয়ে ভেসে যাওয়া। আর নীচে নিবিড়-উজ্জ্বল সবুজ মাঠের ভিতর সেই অজস্র অসংখ্য হরিণের রঙ।

রেল লাইন ছাড়িয়ে কতদূরে ময়ূরাক্ষী? আরো কত দূরে?

কাঁকর-ছড়ানো মাটি। অসুর-মুণ্ডের মতো ছোট-বড় ঢিবি ছড়িয়ে আছে আচক্রবাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো এক রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন এই মাঠ। কোনো কোনো ঢিবির ওপরে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার এক আধটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। হাঁপানি রোগীর গলায় অতিকায় মাদুলীর মতো এক একটা হাঁড়ি ঝুলছে কোনো-কোনোটাতে। রুক্ষ মাটির যা শ্রী—এক ফোঁটাও রস গড়ায় বলে মনে হয় না।

ক্যান্‌ভাসার শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী, হাল সাকিন বারোর সাত ছকু খানসামা লেন, জিলা কলিকাতা—একবার থমকে দাঁড়ালো। এ জেলায় এই তার প্রথম আবির্ভাব। শুনেছিল ময়ূরাক্ষী পার হয়ে—একটা শাল-পলাশের বন ছাড়ালেই ব্রজপুর গ্রাম। ময়ূরাক্ষী নদী, শাল-পলাশের বন, গ্রামের নাম ব্রজপুর। তিনটে একসঙ্গে মিলে মনের মধ্যে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল দস্তুরমতো। সুধাংশু চক্রবর্তী কল্পনাতে আরো খানিক জুড়ে নিয়েছিল এদের সঙ্গে সঙ্গে। হোক শীতকাল, থাকুক চারদিকে শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুতা—তবু ব্রজপুর এদের চাইতে অনেকখানি আলাদাই হবে নিশ্চয়। তার গাছে গাছে কোকিল ডাকতে থাকবে, ফুলের গন্ধ বয়ে বেড়াবে বাতাস, তার মাঠে মাঠে শ্যামলী ইত্যাদি ধেনুরা চরে বেড়াবে। বেণু বাজবে এবং সন্ধ্যে হলেই শ্বেত-চন্দন ঘষা একখানি পাটার মতো পূর্ণচাঁদ উঠে আসবে আকাশে।

কিন্তু কোথায় কী!

আপাতত মাঠ আর মাঠ। দেড় বছরের পুরোনো জুতোটা নতুন জুতোর মতো মচ্ মচ্ আওয়াজ করছে তলার কঠিন কাঁকরে। এদিকে কি ডালভাঙা ক্রোশ? তিন মাইল পথ যে আর ফুরোয় না!

সামনেই ছোট খাল একটা। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে পড়েছে অনেকখানি ঢালুতে। হোক মরা খাল—তবু তো এতক্ষণে জলের দেখা পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল, সে বুঝি বোখারা-সমরখন্দের কোনো মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ হাঁটছে!

একটা গোরুর গাড়ি ছপ্ছপিয়ে উঠে এল খাল পেরিয়ে। চাকা থেকে তরল কাদা গলে গলে পড়ছে তার। গাড়োয়ান সাঁওতাল। খোলা ছইয়ের ভেতরে রূপোর হাঁসুলীপরা একটি কালো মেয়ে বসে আছে—নিবিড় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে তাকালো সুধাংশুর দিকে। এক ফালি জলের সঙ্গে একটি তরল দৃষ্টি যেন সুধাংশুর সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে।

—ভাই, ময়ুরাক্ষী কতদূর?

গাড়ির ভেতরে মেয়েটি হেসে উঠল। গাড়োয়ান আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে দেখল সুধাংশুর। বিদেশী।

বললে, এটাই তো ময়ুরাক্ষী নদী।

—অ্যাঁ! এই নদী!

কয়েক বছর আগে যে সুধাংশু চক্রবর্তী বাস করত মেঘনা নদীর ধারে এবং অধুনা বাস্তুহারা হয়ে সে বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে বাসা বেঁধেছে, তার পক্ষে এটা শোনবার মতো খবর বটে! নদী এর নাম! এবং কাব্য করে একেই বলা হয় ময়ুরাক্ষী!

কিন্তু বিস্ময়টা ঘোষণা করে শোনাবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না। গোরুর গাড়ীটা ততক্ষণে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটার ওপরে উঠে গেছে—শুধু খোলা ছইয়ের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে এখনো।

আপাততঃ নদী পার হতে হচ্ছে তা হলে।

খেয়া পাড়ি দেবার সমস্যা নেই—সাঁতারও দিতে হবে না। এক হাতে জুতো, আর এক হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ধরলেই চলবে। সুধাংশুও তাই করল। পায়ের তলায় কিছু দলিত শ্যাঁওলা, ভাঙা ঝিনুকের টুকরো আর এঁটেল কাদা অতিক্রম করে সে ওপারে পৌঁছুল। জুতোটা একরকম করে পরা গেল বটে, তবে পায়ের গোড়ালিতে আঠার মতো চটচট করতে লাগল।

নদী তো মিটল। এবারে শাল-পলাশের বন?

সেও কাছাকাছিই ছিল; কিন্তু এর নাম বন? গোটা কয়েক মাঝারি ধরণের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। সুসঙ্গের পাহাড়ে-দেখা নিবিড় মেঘবর্ণ অরণ্য স্বপ্নের মতো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। এটা পার হলেই ব্রজপুর। সুধাংশুর কল্পনা ফিকে হতে শুরু করেছে।

ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।

লাল মাটির দেওয়াল—কিংবা টিনের চাল। খান দুই নোনাধরা দালান। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের চারদিকে অজস্র পোড়া মাটির ছোট ছোট ঘোড়া। ও জিনিসটা সুধাংশু আগেই চিনেছে—ধর্মঠাকুরের ঘোড়া ওগুলো।

কিন্তু ঘোড়া জ্যান্তই হোক আর মাটিরই হোক সে কখনো কথা কয় না এবং যুগের মাহাত্ম্যে ধর্মঠাকুর সংপ্রতি নির্বাক। পতিত-

পাবনী এম-ই স্কুলের হেড্ মাস্টার নিশাকর সামন্তের হদিশটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে ? কাছাকাছি কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের রোদে গ্রামটা ঘুমিয়ে আছে যেন।

আরো দু পা এগোতেই একটি ছোট দোকান।

তোলা উনুনে খোলা চাপিয়ে একটি লোক খই ভাজছে। বাঁশের খুন্তি দিয়ে নাড়ছে গরম বালি। পট্-পট্ করে ধান ফুটছে—মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খইয়ের দল খোলা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে।

সুধাংশু তাকেই নিবেদন করল প্রশ্নটা।

—ইস্কুল ?—দু তিনটে বিদ্রোহী খইয়ের আঘাতে মুখখানাকে বিকৃত করে লোকটা বললে, এগিয়ে যান সামনে। লাল রঙের বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবেন।

এ বাঁকটা আর ডালভাঙা ক্রোশ নয়—কাছাকাছিই ছিল এবং টিনের চালওয়ালা লাল রঙের বাড়িটাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করল না। আশায়-আনন্দে উৎসুক পা চালিয়ে দিলে সুধাংশু। 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি'র মালিক অক্ষয়বাবু আগেই চিঠি দিয়েছেন নিশাকর সামন্তকে। দু'জনে কিরকম একটা বন্ধুত্ব আছে। নিশাকর সামন্ত তাঁর ওখানে সুধাংশুকে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁরি বাড়িতে দিন চারেক থেকে আশেপাশের স্কুলগুলোতে বইয়ের ক্যান্‌ভাস করবে সুধাংশু। ইস্কুলের দর্শন পেয়ে তাই স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। অর্থাৎ থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে, কিছু খাদ্য জুটবে এবং হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে ঘণ্টা কয়েক!

ইস্কুল টিফিন পিরিয়ড চলছে খুব সম্ভব। বাইরে দাপাদাপি করছে একদল ছোট ছোট ছেলে। একটা টিনের সাইনবোর্ডে কাত

হয়ে ঝুলছে ইস্কুলের নাম। পিটা মুছে গেছে—মনে হচ্ছে অতীতপাবনী।

জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া বারান্দাটা পার হয়ে সুধাংশু এসে ঢুকল টীচার্স-রুমে। খান কয়েক কাঠের চেয়ার—মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। কাচভাঙা আলমারিতে ছেড়া-খোঁড়া খান ত্রিশেক বই ; র‍্যাকে সাজানো গোটা কয়েক ম্যাপ। আলমারীর মাথা থেকে তিন-চারখানা বেতের ডগা উঁকি মারছে। আর এই দীনতার ভেতরে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে দেওয়ালে একটি সুহাসিনী সুন্দরী মহিলার মস্ত একখানা অয়েলপেইন্টিং। খুব সম্ভব উনিই পতিত-পাবনী।

ঘরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুধাংশু। কলাই করা বড় একখানা থালায় একটি লোক তেল আর চীনে বাদাম দিয়ে মুড়ি মাখছে প্রাণপণে। খুব সম্ভব দপ্তরী। ছ' জোড়া চোখ লোলুপভাবে তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। টিফিনের ব্যবস্থা।

সুধাংশু একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ছ'জন মানুষ একসঙ্গে ফিরে তাকালেন। শীর্ণকান্তি জীর্ণদেহ ছ'টি খাঁটি স্কুল-মাস্টার। আসন্ন টিফিনের ব্যাপারে ব্যাঘাত পড়ায় স্পষ্ট অপ্রীতি ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখে।

সমবেত ছ'জনের উদ্দেশ্যেই কপালে হাতটা ঠেকাল সুধাংশু। তারপর বললে, নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে আসছি।

ততক্ষণে তার কাঁধে কলেজ-স্কোয়ারের স্ফীতোদর ছিটের ঝোলাটি চোখে পড়েছে সকলের। একজন চশমাটা নাকের নিচের দিকে ঠেলে নামালেন খানিকটা। বিরসমুখে বললেন, বইয়ের এজেন্ট তো ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বসুন একটু।

একটা খালি টিনের চেয়ার ছিল একটেরেয়। সুধাংশু বসতেই ঠক-ঠক করে তুলে উঠল বারকয়েক। একটা পায়া একটু ছোট আছে খুব সম্ভব।

—আমি নিশাকরবাবুর কাছে এসেছিলাম—কলাইকরা থালায় মুড়ি মাখবার শব্দটা সুধাংশুর অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

—হেড্‌মাস্টারমশাই?—প্রথম সম্ভাষণ যিনি করেছিলেন, তিনিই বললেন, তিনি তিন মাসের ছুটিতে দেশে আছেন। তাঁর খুড়িমা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে তারপর বিষয়-সম্পত্তির কী সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে ফিরে আসবেন।

চমকে উঠল সুধাংশু। ঢোঁক গিলল একটা।

—দিন চারেক আগে আমাদের পাবলিশার অক্ষয়বাবু তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন—

একটা প্লেটে করে খানিক মুড়ি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আর একজন বললেন, সেটা নিশ্চয় রি-ডাইরেক্টেড হয়ে সাঁইথিয়ায় চলে গেছে—আপনি ভাববেন না।

না, ভাবনার আর কী আছে! মুড়ি চিবোনোর শব্দে সুধাংশু আবার ঢোক গিলল। মধ্য তুপুরের তীব্র ক্ষুধা এতক্ষণে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার। নিশাকরবাবুর বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবু—এই তুপুরেও অন্তত তুটি ভাতের একটা নিশ্চিত আশা মনের মধ্যে জেগে ছিল তার। সুধাংশু এতক্ষণে বাস্তবভাবে অনুভব করল—ব্রজপুর সত্যিই অন্ধকার। তার কানু মথুরায় নয়—সাঁইথিয়ায় বিদায় নিয়েছেন!

কিছু ভাবতে না পারার আচ্ছন্নতায় সুধাংশু ঝিম ধরে বসে রইল কতক্ষণ। কী অদ্ভুত লোলুপভাবে যে মুড়ি খাচ্ছে লোক-গুলো! একজন আবার টুকটুকে একটা পাকা লঙ্কায় কামড়

দিচ্ছে—সুধাংশুর শুকনো জিভের আগায় খানিকটা লালা ঘনিয়ে এল। রিফ্লেক্‌স্ অ্যাক্‌শন! আঃ—অত শব্দ করে অমন-ভাবে চিবোচ্ছে কেন ওরা? ওদের খাওয়া কি শেষ হবে না কখনো?

আর থাকা যায় না। ওই একটানা শব্দটা অসহ্য।

—বই দেখবেন না?

—হাঁ—হাঁ নিশ্চয়।— তিন চারজন ঘাড় ফেরালেন। মুড়ির পাত্রগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। দু জন উঠে গেলেন হাত ধুতে।

—এই দেখুন—মুড়ি ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই একরাশ বই ছড়িয়ে দিলে সুধাংশু।

—ওঃ! গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং? আপনাদের অনেকগুলো বই তো আমাদের রয়েইছে মশাই!—

ধুতির কোঁচায় হাত মুছে একজন একটা বই তুলে নিলেন: 'জ্ঞানের আলো', 'স্বাস্থ্য সমাচার', 'ভূগোলের গল্প'—সবই তো আছে আমাদের।

—এবারেও যাতে থাকে, সেইজন্যেই আসা—অনুগত বিনয়ে সুধাংশু হাত কচলালো: তা ছাড়া আমাদের নতুন ট্রান্‌স্লেসনের বইটা দেখেননি বোধ হয়? বাই কে-পি পাঁজা, এম-এ বি-টি, হেড-মাস্টার বামুনপুকুর এইচ-ই স্কুল—

—হুঁ!

—বাড়িয়ে বলছি না স্যার, বাজারের যে কোনো চল্‌তি বইয়ের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখুন। সিম্‌প্লেস্ট প্রোসেস্, নতুন নতুন আইটেম, একটা ওয়ার্ডবুকও আছে সঙ্গে—

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজল। অবশিষ্ট টীচারেরা গোগ্রাসে মুড়ি শেষ করলেন।

প্রথম লোকটি হাই তুললেন: আপনি আপাতত এই এরিয়াতেই তো আছেন? কাল তা হলে একবার দশটার দিকে আসুন। তখনই কথাবার্তা হবে। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—এবার আমার ওপরেই ভার। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার!—অগত্যা থলের মধ্যে বইগুলো পুরে সুধাংশু উঠে পড়ল।

আসুন। অর্থাৎ আবাহন নয়—বিসর্জন। আপনি যান: কিন্তু যাওয়া যায় কোথায়?

গ্রামটা যখন মাঝারি, তখন জেলা বোর্ডের একটা ডাক-বাংলো কোথাও থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু এই জীর্ণ চেহারার দীন ক্যান্‌ভাসার—চৌকিদার কি আমল দেবে? আর যদি বা থাকতেও দেয়—খাওয়া ছাড়াও দৈনিক ছটো টাকা চার্জ তো নির্ঘাৎ। স্কুল বইয়ের ক্যানভাসারের পক্ষে দৈনিক ছু টাকা দিয়ে ডাক-বাংলোয় থাকা আর বারোর সাত ছকু খানসামা লেন থেকে চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠা—এ ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই কিছু।

অতএব—

অতএব ব্রজধাম ছেড়ে আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা? উঁহু, সেও অসম্ভব। এ এরিয়াতে আশে-পাশে পাঁচ-ছ'টা স্কুল রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে চলে গেলে নিস্তার নেই। অক্ষয়বাবু ঠিক টের পেয়ে যাবেন এবং, অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীগুলো দাপাদাপি করছে। সেই খইয়ের দোকানটাকে মনে পড়ল। কয়েকটা কালো ছিটধরা চাঁপা কলাও ঝুলতে দেখেছিল সেখানে। কিঞ্চিৎ ফলারের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়।

শুধু চাঁপা কলা নয়, মোষের ছুধও ছিল এবং একটু মোদো-

গন্ধধরা ভেলিগুড়। পনেরো পয়সায় খাওয়াটা নেহাৎ মন্দ হল না। আচমকা সুধাংশুর মনে হল, এমন খই-কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা ?

শীতের নরম রোদ। পেটে খাবার পরে গা এলিয়ে আসছে। একটু শুতে পারলে হত।

কাছেই ধর্মঠাকুরের বটগাছ। ছিমছাম জায়গাটি। দেবতার স্থান, অতএব সর্বজনীন সম্পত্তি। এখানে হত্যে দেবার নাম করে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়।

যা ভাবা—তাই কাজ। ব্যাগের ভেতর থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা র‍্যাপারটা সে বের করে আনল। পথে বিছানাটা এক জায়গায় রেখে এসে ভারী ভুল করেছে সে। নিশাকরবাবুর ওখানে বিছানা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—বন্ধু লোক !—অক্ষয়বাবু বুঝিয়েছিলেন।

ফিরেই যেতে হবে। থানা গাড়তে হবে তিন মাইল দূরের স্টেশনেই। ওখান থেকে যতটা 'এরিয়া' কভার করা যায়। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ল সুধাংশু। ধর্মঠাকুরের মাটির ঘোড়াগুলো কেমন পিট-পিট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কতক্ষণ ?

—ও মশাই—কত ঘুমুবেন ? উঠুন—উঠুন—

ঘোড়াগুলো ডাকছে নাকি ? সুধাংশু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল

—আপনি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন্—চলুন এবার—

ঘোড়া নয়। একটি মানুষ এবং স্কুলের একজন মাস্টার।

—কেন বলুন তো ?

সুধাংশুর মনে পড়ল, এই লোকটিকেই টীচার্স-রুমে বসে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা চিবুতে দেখেছিল সে।

মাস্টার মিটি-মিটি হাসলেন : আছে মশাই, ব্যাপার আছে। সাধে কি আর এসেছি—ওপরওলার হুকুমে।

—ওপরওলার হুকুমে!—সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ?

—ছোঃ!—মাস্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : ওকে কে পরোয়া করে মশাই ? সেক্রেটারীর কুটুম বলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হয়েছে—নইলে ওর বিদ্যে তো ম্যাট্রিক অবধি। গুণের মধ্যে খালি সেক্রেটারির কান ভারী করতে পারে। আমিও শশধর বাঁড়ুয্যে মশাই—আই-এ পাশ করেছি, হেডমাস্টারের লেখাতে ভুল ধরেছি দু-দুবার। গজেন বিশ্বাসকে আমি গ্রাহ্যও করি না।

—তবে কার তলব ? থানার দারোগার নয়তো ?—এবার ভয়ে সুধাংশুর গলা বুজে এল।

—দারোগা আবার কেন ?—শশধর বাঁড়ুয্যে হা-হা করে হেসে উঠলেন : আপনি কি চোর-ডাকাত ? দারোগা নয়—ম্যাজিস্ট্রেট ডেকেছে। চলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট! রহস্য অতল!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধাংশু উঠে পড়ল।

এবং কী আশ্চর্য—যেতে হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নয়, শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে।

বাড়ি রাস্তার ধারেই। সামনে একটি ফুলের বাগান। লাল মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। একটি ছোট ধানের মরাই আর এক পাশে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সুধাংশু থমকে গেল। শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে এতখানি আশা তার ছিল না।

একখানি তক্তপোষের ওপরে, পরিষ্কার একটি সুজনী পাতা। শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল এবং পাশে একটি চেয়ার। আর সব চেয়ে আশ্চর্য—টেবিলের ওপরে কোণাভাঙা সস্তা একটি কাচের ফুলদানিতে সপত্র একগুচ্ছ গন্ধরাজ! এই শীতকালে গন্ধরাজ!

কিন্তু গন্ধরাজের চাইতেও বিস্ময়কর অভ্যর্থনার এই আয়োজনটা। মনে হচ্ছে—সুধাংশুর সম্মানেই ঘরখানাকে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন কনে দেখতে এসেছে সে।

শশধর বললেন, বসুন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকছি।—বলেই আবার হেসে উঠলেন হা-হা করে। তারপর পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে।

সুধাংশু থ হয়ে রইল। এ আবার কোন্ পরিস্থিতি! একটা দুর্বোধ্য নাটকের মতো ঠেকছে সব। অসময়ের গন্ধরাজের একটা মৃদু সৌরভ রহস্যালোক সৃষ্টি করতে লাগল তার চারদিকে!

—মণ্টুদা—চিনতে পারছো না?—কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি সরিয়ে শ্যামবর্ণ একটি তরুণী মেয়ে ঢুকল ঘরে। হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল।

তটস্থ হয়ে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। মণ্টুদা—কে মণ্টুদা?

—দেখুন, আমি তো আপনাকে—

—চিনতে পারোনি—না? কিন্তু আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছি। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারো—কিন্তু আমাকে নয়। কেমন ধরে আনলাম—দেখো।

একটা ভুল হচ্ছে—মারাত্মক ভুল! বলবার চেষ্টায় বার দুত্তিন হাঁ করল সুধাংশু।

—আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না। তোমাকে আমি

জব্দ করতে জানি। বেশি দুষ্টুমি করো তো সব ফাঁস করে দেব—মেয়েটি মৃদু হাসল ঃ দাঁড়াও—তার আগে তোমার চা করে আনি। দিনে এখনো সে পনেরোবার চা খাওয়ার অভ্যাসটি আছে তো ? না—রত্নার শাসনে এখন কমেছে একটু ?

রত্না ? এবার আর হাঁ-টা সুধাশু বন্ধ করতে পারল না।

—ওই দেখো, সাপের মুখে চুণ পড়ল !—মেয়েটি সকৌতুকে হেসে উঠল।

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে শশধর ফিরে এলেন। মেয়েটি একটু-খানি নামিয়ে আনল মাথার ঘোমটা।

শশধর বললেন, তুমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো ওঁর জন্যে। আমি একবার ঘুরে আসি বাগ্‌দীপাড়া থেকে। দেখি বিল থেকে দুটো চারটে কই মাছ ওরা ধরে এনেছে কিনা !

—দেখুন শশধরবাবু—

—পরে দেখব মশাই। এখন সময় নেই—

শশধর বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটি হাসল ঃ পালাবার ফন্দি ? ও হবে না। অনেকদিন পরে ধরেছি তোমাকে। এখন চুপ করে বোসো। আমি চা আনছি—

অতঃপর আবার সেই বিব্রত প্রহর যাপনের পালা সুধাংশুর। এ কী হচ্ছে—এ কোথায় এল সে ! মণ্টুদা বলে তার কোনো নাম আছে একথা সে এই প্রথম শুনল ! এবং রত্না ! সেই-ই বা কে ? বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে যে তার ঘর আলো করে রয়েছে, তাকেও তো সে এতকাল নিভাননী ওরফে বুলু বলেই জানত !

একটা ভুল হচ্ছে—ভয়ঙ্কর ভুল। ভুলটা ভেঙে দিয়ে এই মুহূর্তে তার ভদ্রলোকের মতো সরে পড়া উচিত।

কিন্তু—

কিন্তু চা আসছে এবং এ সময় এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মতো মূঢ়তাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। চা-টা খাওয়া শেষ হলেই এক ফাঁকে ঝোলাটা কাঁধে করে সে উঠে পড়বে। তারপর এক দৌড়ে শালবন ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী পার হতে আর কতক্ষণ!

সামনে ফুলদানি থেকে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে। শীতের ফুল! সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরময় শীতল ছায়া ঘনাচ্ছে। মশার গুঞ্জন উঠেছে। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সুধাংশু অভিভূতের মতো বসে রইল।

ভেতর থেকে গরম ঘিয়ের গন্ধ আসছে। খাবার তৈরি হচ্ছে—এবং নিশ্চয় তারই সম্মানে। সুধাংশুর মুখে আবার লালা জমে উঠল। রিফ্লেক্‌স্ অ্যাক্‌শন! খই জিনিসটা লঘু পাক; কিন্তু চাঁপা কলা আর মোষের দুধও যে এমন অবলীলাক্রমে হজম হয়ে যায়—সে রহস্যই বা কার জানা ছিল! চায়ের প্রলোভনটাকে আরো শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরল ঘিয়ের গন্ধ। রাত্রে স্টেশনের হোটেলে তো জুটবে ট্যাড়শ-চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল—এক টুকরো মাছ যদি পাওয়া যায়, তার স্বাদ মনে হবে পিস্‌বোর্ডের মতো। তার চাইতে এখান থেকে যথাসাধ্য রেশন নিয়ে নেওয়া যাক। হোক ভ্রান্তি-বিলাস, তবু ধরে নেওয়া যাবে এটা বাংলা দেশের পুরোনো আতিথেয়তার নমুনা মাত্র।

গন্ধরাজের সৌরভ ছাপিয়ে লুচির গন্ধ আসছে। সুধাংশু প্রতীক্ষা করে বসে রইল।

একটু পরেই একহাতে সধূম লুচির থালা, আর এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল মেয়েটি।

—এত কেন ?

—খাওয়ার জন্যে।—মেয়েটি হাসল : নাও—আর ভদ্রতা কোরোনা। সামনেই গাড়ু-গামছা রয়েছে—ধুয়ে নাও হাতমুখ।

যা হওয়ার হোক। এস্‌পার কি ওস্‌পার। মেঘনার ধারের সুধাংশু চক্রবর্তী আর বিস্মিত হবেনা ঠিক করল। দেশ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে—তখন শিশিরে আর ভয় নেই তার।

বেপরোয়া হয়ে লুচি-বেগুন ভাজায় মনোনিবেশ করল সে।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কত রোগা হয়ে গেছ আজকাল!

শুনে রোমাঞ্চ হয় যে সুধাংশুও একদিন মোটা ছিল!

মেয়েটি বললে, সেই দশ বছর আগে যখন রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছিলে, সেদিন কত কথাই উঠেছিল গ্রামে; কিন্তু আমি তো জানতাম—যা করেছ, ভালোই করেছ!

রত্নাকে নিয়ে পালানো! হে ভগবান, রক্ষা করো! সুধাংশুর গলায় লুচি আটকে আসতে লাগল। তাদের হেডমাস্টার থাকলে এখন সাক্ষী দিয়ে বলতেন, ইস্কুলে বরাবর গুড-কণ্ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছে সে!

—কাকিমা তো অগ্নিমূর্তি!—মেয়েটির চোখে স্মৃতির দূরত্ব ঘনিয়ে আসতে লাগল : আমাকে এসে বললেন, কণা, তুই দুঃখ পাসনি। ওর কপালে অনেক শাস্তি আছে—দেখে নিস্। সত্যি বলছি মণ্টুদা—বিশ্বাস করো আমাকে। আমি খুসি হয়েছিলাম। জাত বড় নয়—রত্না সত্যিকারের ভালো মেয়ে। আর তোমাকেও তো জানি। প্রাণে ধরে রত্নাকে তুমি কখনো দুঃখ দেবে না।

আহা, এই কথাগুলো যদি বুলু শুনত! তার ধারণা, স্বামী

হিসেবে যে বস্তুটি তার কপালে জুটেছে, পুরুষের অপদার্থতম নমুনা হচ্ছে সেইটিই !

—সত্যি, রত্নার কষ্ট চোখে দেখা যেত না। সৎমা কী অত্যাচারই করত ওর ওপরে। কতদিন খেতে পর্যন্ত দেয়নি। তবু মেয়েটা মুখ ফুটে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি কখনো। এমন ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে আর হয়না। জাতটা কিছু নয় মণ্টুদা—জীবনে সত্যিই তুমি জিতেছ !

অজানা-অদেখা রত্নার জন্যে এবারে সুধাংশুরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে পড়ে গেল, ঝগড়া করবার আগে কোমরে হাত দিয়ে বুলুর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

লুচির থালা শেষ হতে সময় লাগল না।

—আর দুখানা এনে দিই মণ্টু দা ?

—না—না—সর্বনাশ !

কণা বলে চলল, তোমার চেহারা বদলেছে মণ্টু দা—কত ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ। তবু আমি কি ভুল করতে পারি ? সেই চোখ, সেই কোঁকড়া চুল, সেই মুখের আদল, সেই হাঁটবার ভঙ্গি। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন ধর্মখোলার দিকে চলে যাচ্ছিলে, তখনি আমি চিনে ফেললাম ! তারপর উনি যখন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন যে, কলকাতা থেকে বইয়ের এজেণ্ট এসেছে, তখনি আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। এখনো তো সেই বইয়ের কাজই করছ ?

—হুঁ !—সংক্ষিপ্ততম উত্তরই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

—শোনো—কণার গলার স্বর নিচু হয়ে এল : আমি ওকে বলেছি, তুমি সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই।—কণা অর্থগভীর হাসি হাসল : তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়োনা —কেমন ?

—না—না ।—সুধাংশু আন্তরিকভাবে মাথা নাড়ল : তা কখনো বলতে পারি ! তা হলে আজ বরং উঠি আমি । রাত হয়ে যাচ্ছে—আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে ।

—বা রে, ভেবেছ কী তুমি ? এম্‌নি ছেড়ে দেব ? ওঁকে মাছ আনতে পাঠালাম—দেখলে না ? আমার রান্না খেতে তুমি কত ভালোবাসতে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? ও সব হবে না । যাও দেখি—কেমন যেতে পারো ।

—কিন্তু বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই—

—কণা গরীব হতে পারে, কিন্তু তোমাকে শুতে দেবার মতো একখানা লেপ আর একটা বালিশ তার জুটবে। বেশি ভদ্রতা কোরোনা আমার সঙ্গে—বুঝেছ ?

বুঝেছে বই কি সুধাংশু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতারকের একটা চমৎকার ভূমিকায় নেমে পড়েছে সে। এখন আর সহজে পালাবার উপায় নেই। শশধর তাকে কখোনোই দেখেন নি এবং কণা তাকে মণ্টু দা বলে প্রমাণ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতএব জালিয়াতিটা অন্তত আজ রাতে ধরা পড়বে না। কাল ভোরেই তাকে পালাতে হবে—এবং এ এরিয়া ছেড়ে। তারপরে অক্ষয়বাবু রইলেন আর সে রইল।

বাগানে টিনের গেট খুলে কে ভেতরে ঢুকল। পাওয়া গেল চটির আওয়াজ।

শশধর ফিরে এলেন। হাতের বাঁধা ন্যাকড়াটার মধ্যে উত্তেজিত দাপাদাপি চলছে।

উল্লসিত হয়ে শশধর বললেন, অতিথি-সেবার পুণ্যে আজ ভালো মাছ পাওয়া গেল কণা। দশটা বড় বড় কই।

কণার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

—মণ্টুদার ভারী প্রিয় মাছ। মনে আছে মণ্টুদা—রেলের

বাঁধের তলা থেকে একবার তুমি আর আমি ছিপ দিয়ে এক কুড়ি কই ধরেছিলাম? তারপর বাড়িতে ফিরে মার হাতে সে কি পিট্টি!

শশধর সস্নেহ হাসি হাসলেন। ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারটায়ঃ ভাই বোনে মিলে খুব দুষ্টুমি হত বুঝি? তা বেশ; কিন্তু শিবেন বাবুকে এখনো চা দাওনি?

শিবেনবাবু! সুধাংশু আর একবার ঢোঁক গিলল। নিজের নামটা প্রায় অষ্টোত্তর শতনামের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

—তুমি আসবে বলেই দেরী করছিলাম।

—দাও—দাও।—শশধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ বিকেলের চা-ই তো এখনো জোটেনি ওঁর। কুটুম মানুষ—বদনাম গাইবেন।

—মন্টুদা খুব ভালো ছেলে—কারো বদনাম করে না—কণা ভেতরে চলে গেল।

খাওয়ার দিক থেকে কিছুমাত্র ত্রুটি হলনা। বারোর সাত ছকু খানসামা লেনের সুধাংশু চক্রবর্তী এমন টাটকা কই মাছ চোখে দেখেনি দেশ ছাড়বার পরে। এ অঞ্চল নাকি কাঁকরের জন্যে বিখ্যাত, কই চালে তো একটি দানা কাঁকরেরও সন্ধান পাওয়া গেল না!

শশধর গল্প করলেন অজস্র। দেশের কথা, ইস্কুলের কথা। যোগ্যতায় বি-এ ফেল হেড্ মাস্টার নিশাকর সামন্তের পরেই তাঁর স্থান—এ কথাও ঘোষণা করলেন বার বার। শুধু সেক্রেটারীর কুটুম ওই গজেন বিশ্বাস! মামার জোরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার —নইলে একটা ইংরেজি সেনটেন্সও কারেক্ট করে লিখতে জানে নাকি?

—আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আপনি আমার কুটুম—

গ্রেট্ ইণ্ডিয়ানের সব বই আমি ধরিয়ে দেব স্কুলে। ও দায়িত্বটা এখন আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

বাইরে কন্‌কনে শীতের রাত। ভারী হাওয়ায় অসময়ের গন্ধ-রাজের গন্ধ। মাটির দেওয়ালে কেরোসিনের আলোর কাঁপনলাগা ছায়া। বিমিশ্র অনুভূতি বিজড়িত একটা স্তব্ধ মন নিয়ে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে রইল লেপের মধ্যে। আশ্চর্য! জীবনটা এত আশ্চর্য—কে জানত!

মণ্টুদা?

কণা ঘরে ঢুকল।

—জেগেই আছি। শশধরবাবু কী করছেন?

—ওঁর তো এখন মাঝ রাত। পড়া আর মড়া। শুনছ না—নাক ডাকছে?—কণা খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠল: ওই নাকের ডাকের ভয়ে পাড়ায় চোর আসতে পারে না।

সুধাংশু অপ্রতিভের মতো হাসল। টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারটা নিয়ে বসল কণা। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল লণ্ঠনের বাড়ানো কমানোর চাবিটা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না।

সুধাংশু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল কণার দিকে। এক কালে সুশ্রীই ছিল মুখখানা। এখন পরিশ্রম আর চিন্তার একটা ম্লান আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপরে।

তারপর:

একটা কথা বলব ভাবছি মণ্টুদা। বলব কিনা বুঝতে পারছি না।

—বলো। অত সংকোচের কী আছে?

—না, তোমার কাছে সংকোচের আমার কিছুই নেই।—কণা

ভেতরের দিকে মাথা ফিরিয়ে একবার কী দেখল, যেন কান পেতে শুনল শশধরের নাকের ডাকটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল : রত্না অমন করে মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে তোমার ঘরে হাঁড়ি ঠেলার ব্যবস্থাই যে আমার পাকা হয়ে গিয়েছিল সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে ?

সুধাংশু শিউরে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে কণার চোখ। ঘন বর্ষার মেঘের মতো কী যেন টলমল করছে সেখানে।

কণা বললে, ভয় নেই। তুমি ভেবোনা—আমি রাগ করেছি। আমি তো জানি রত্না কত ভালো মেয়ে।—কণার চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বুকের ওপর : আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি মন্টুদা !—

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে কণা আবার হেসে উঠল। শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের লীলার মতো তার হাসি-কান্না দেখতে লাগল সুধাংশু।

কণা বলে চলল, দশ বছর পরে দেখা, ভেবেছিলাম, কথাটা বলা ঠিক হবে না। তারপরে ভেবে দেখলাম, পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারি !—গলার স্বর নামিয়ে কণা বললে, মন্টুদা, কুড়িটা টাকা দেবে আমাকে ?

কুড়ি টাকা! ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী সভয়ে নড়ে উঠল।

আঁচলের গিঁট থেকে একটা চিঠি বের করলে কণা। বললে, এইটে পড়ো।

সুধাংশু বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিখানা। বোলপুর থেকে কোন্ এক বিনু চিঠি দিয়েছে দিদিকে। তার ম্যাট্রিকের ফী এমাসেই দিতে হবে—দিদি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেয়।

হতবাক হয়ে চিঠিটার দিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—অবাক হয়ে গেলে তো? দশ বছর আগে যে ছোট্ট বিন্নুকে দেখেছিলে, সে আর ছোটটি নেই। ম্যাট্রিক দেবে এবার। ভালো ছেলে—ভালো করেই পাশ করবে। অথচ ফীয়ের টাকা নিয়েই মুস্‌কিল। বাবার অবস্থা তো সবই জানো—কোনোমতে আধপেটা খেয়ে আছেন। অথচ এদের কাছেও চাইতে পারি না। নিজেরই সংসার চলে না, তবু বাবাকে যখন পারেন দু পাঁচ টাকা পাঠান। এই কুড়িটা টাকার জন্যে ওঁকে আর কী ভাবে চাপ দিই বলো?

সুধাংশু তেমনি নির্বাক হয়ে রইল।

কোমল গভীর গলায় কণা বললে, একদিন তোমার কাছে সবই আমার চাইবার দাবী ছিল মণ্টুদা। আজ সেই সাহসেই কথাটা বলতে পারলাম। রত্নাকে আমি সবই তো দিয়েছি—কণার চোখে জল চকচক করতে লাগল: মোটে কুড়িটা টাকাও কি আমি চাইতে পারব না?

অভিনেতা সুধাংশুর কাছে অভিনয়টা কখন সত্যি হয়ে উঠল সে নিজেই জানে না। তেমনি গভীর গলায় সেও বললে, নিশ্চয় কণা—নিশ্চয়।

বালিসের তলায় রাখা মাণিব্যাগ্‌টার দিকে সে হাত বাড়ালো।

—এখুনি?—কণা বললে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কলকাতা গিয়েও বিন্নুকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও বরং।

ব্যাগটা বের করে এনে সুধাংশু বললে, না—না। অঢেল কাজ নিয়ে থাকি, কলকাতায় গিয়ে ভুলে যেতে কতক্ষণ? টাকাটা তুমিই রাখো কণা।

শীতের হাওয়ায় ঘরে গন্ধরাজের মৃদু সুরভি। দেওয়ালে ছায়া

কাঁপছে। আশ্চর্য তরল কণার চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এবার আর সে তা মুছতে পারল না।

শাল-পলাশের বনে ভোরের কুয়াশা। পায়ের তলায় শিশির-ভেজা ধুলো। ময়ূরাক্ষী আর কতদূরে?

ঠাণ্ডা নরম রোদে—শালের পাতায় সোনালি ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আর মন্থর পা ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ ক্যান্‌ভাসার সুধাংশু চক্রবর্তীর মনে হল—অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে?—সে—না কণা? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার একটা চক্রান্ত কিনা?

কিন্তু তা হলে কি এত মিষ্টি লাগত গন্ধরাজের গন্ধটা? এই সকালে কি এত সুন্দর দেখাত এই শাল-পলাশের বন? আর সামনে—সামনে ওই তো ময়ূরাক্ষী! ময়ূরের চোখের মতোই সোনার আলো-ছড়ানো কী অপরূপ নীল ওর জল।

এই কুড়িটা টাকার হিসেব সহজে বোঝানো যাবে না ব্যবসায়ী অক্ষয়বাবুকে। এ এরিয়ার কাজও সবই তো পড়ে রইল। আর অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

এর ঋণ শোধ করতে হবে এক মাস রেশন না এনে; কণার চোখের জলের দাম শোধ করে দিতে হবে বুলুকে। পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই! শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ার খরচ জোটে না। তবু একজন তো ম্যাট্রিকের ফী দিতে পারবে—একজন তো কৃতী হতে পারবে জীবনে!

কুড়িটা টাকার চেয়ে ঢের বেশি সত্য বুকের পকেটে এই গন্ধরাজ দুটো। অসময়ের ফুল। কাচের ফুলদানিটা থেকে চুরি করে এনেছে সুধাংশু—পালিয়ে এসেছে ভোরের অন্ধকারে। যে অন্ধকারে ব্রজপুর একটা স্বপ্নমাধুরী নিয়ে পেছনে পড়ে রইল!

সামনে ময়ূরাক্ষী। কী আশ্চর্য নীল সোনালা ওর জল!

উন্মেষ

বড় রাস্তার মোড়ের কাছে একটা সোরগোল উঠল। দু' চারজন পথে নেমে এল, কিছু লোক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দুধারে—যেমন করে দাঁড়ায় প্রোসেশন যাওয়ার সময়। যারা নামল না, তারা বকের মত গলা বাড়িয়ে দিলে বারান্দা থেকে।

ব্যাপার আর কিছু নয়—নৃপেন রায় আসছেন।

কে এই নৃপেন রায়? দেশনেতা নন, রাজা মহারাজা নন, সিনেমার অভিনেতাও নন। কোনো আশ্রমে-টাশ্রমে মোটা টাকাও দান করে বসেননি। তবু তাঁর সম্পর্কে লোকের সীমাহীন কৌতূহল।

কেন যে কৌতূহল, তার জবাব পাওয়া গেল যখন তিনি বাঁক ঘুরে সামনে এসে পৌঁছুলেন।

ছ হাতের মতো লম্বা। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো বাবরী চুল—সংপ্রতি বিপর্যস্ত। লম্বাটে মুখের কোণিক হাড়গুলোতে অনেক ডাম্বেল কষা আর মুগুরভাঁজার কাঠিন্য। ঢালের মতো চওড়া বুক—আজানুলম্বিত পেশল হাত দুখানিকে মহাবাহু ছাড়া আর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। পদ্মপলাশ বিস্তৃত চোখ এবং সে চোখ পলাশ ফুলের মতোই আরক্তিম।

পরনে ব্রীচেস্, কাঁধে ঝোলানো দু-দুটো বন্দুক। ভয়ঙ্কর মানুষটাকে তা আরো বীভৎস করে তুলেছে; কিন্তু তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে একটি মেয়েও আছে। তাঁরি মেয়ে। তার আকর্ষণও কম নয়।

বছর বারোর মেয়ে। বব্ ছাঁটা ধূলিরুক্ষ চুল। খাকি রঙা সালোয়ারের ওপর একটি খাকি শার্ট পরা। মেয়েটির গলায় টোটার মালা। শুধু টোটা নয়—আর একছড়া মালাও আছে। তাতে ঝুলছে রক্তমাখা গোটা পাঁচেক স্নাইপ এবং একজোড়া 'চায়না ডাক'। মেয়েটির জামার এখানে ওখানে সে রক্তের ছোপ লেগেছে—যেন ভৈরবীর মূর্তি !

সব মিলিয়ে দৃশ্যটাকে ভয়ানক বললেও কম বলা হয়। পৈশাচিক।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন মন্তব্য ছুড়ে দিলে একটা।

—দেখেছ কাণ্ড ! মেয়েটাকে শুদ্ধ কী বানিয়ে তুলছে !

আর একজন বললে, লোকটা একবারে অমানুষ।

—যা বলেছ !—কেউ সরস করে ব্যাখ্যা করে দিলে জিনিসটা : মানুষ নিশ্চয় নয়। রাক্ষস।

বাপ মেয়ে কথাগুলো কেউ শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। শুনলেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না নৃপেন রায়। জীবনে করেনওনি কোনোদিন।

মাথার ওপর উঠে আসা দুপুরের সূর্যের কড়া রোদে দুজনে সোজা চলে গেলেন। দুজনেই বুট পরা, শুধু বহুদূর থেকেও সেই দু'জোড়া বুটের অস্পষ্ট হয়ে আসা মচ্‌মচানি শোনা যেতে লাগল।

শহরের একটেরেয় নৃপেন রায়ের বাড়ি। সামনে একখানা মাঝারি ধরণের বাগান। তাতে একটি গন্ধরাজ, একটি ম্যাগ্‌নোলিয়া এবং দুটি শিউলি। একপাশে বহু পুরোনো একটি আমগাছ, তাতে আজকাল আর ফল ধরে না। বসন্তের হাওয়ায় কয়েকটি শীর্ণ মুকুল দেখা দিয়েই ঝরে যায় বিবর্ণ জীর্ণতায়। একদিকে বেশ পুরু একটি

কেয়া ঝোপ। বাড়ির গায়ে কেয়াবন কোনো গৃহস্থের ভালো লাগার কথা নয়—বর্ষায় ফুল ফুটলে তার পাগল করা গন্ধে নাকি আনাগোনা শুরু হয় গোখরো সাপের। কিন্তু ওসব কোনো কুসংস্কার নেই নৃপেন রায়ের। আর এ ছাড়া বাগানের সবচেয়ে বিশেষত্ব হল, সযত্নরোপিত নানা জাতের ক্যাক্‌টাস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশির ভাগই তীক্ষ্ণ কাঁটায় আকীর্ণ—নানা বিচিত্র ধরণের ফুল ফোটে তাতে। শিকার আর ক্যাক্‌টাসের পরিচর্যা—এই হল নৃপেন রায়ের প্রধান ব্যসন।

বাড়িটা বড়—কিন্তু এখন শ্রীহীন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা আর চা-বাগানের মোটা রকমের শেয়ার রেখে বাপ চোখ বুজেছিলেন। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা কয়েকটি বছরের মধ্যেই উড়িয়েছেন নৃপেন রায়। এখন সংসার চলে বাঁধা মাইনের মতো শেয়ারের একটা নিয়মিত আয়ে। তারও পরিমাণ উপেক্ষার নয়। খুশিমতো আর অপচয় করা চলে না বটে, কিন্তু রুচিমাফিক অপব্যয়ে বাধা নেই এখনো। সে অপব্যয়টা চলে শিকার আর বিলাতী মদের রন্ধ্রপথে।

নৃপেন আর তাঁর মেয়ে গৌরী—এই দুজনকেই নিয়েই সংসার। একটা বুড়ো চাকর আছে বাপের আমলের; চোখে অল্প অল্প ছানী পড়েছে, কানেও কম শোনে। সংসারের ঝক্কিটা পোয়াতে হয় তাকেই। গৌরীর বছর দুই বয়েসের সময় নৃপেন রায়ের স্ত্রী স্বামীর আটত্রিশ বোরের রিভলবারটা দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই থেকে ওদিকটাতে নিশ্চিন্ত হয়েছেন নৃপেন রায়। তারপরে আর বিয়ে করেন নি। মেয়েদের তিনি সহ্য করতে পারেন না।

বাইরের ঘরে ঢুকে একটা সোফার ওপর বন্দুক দুটোকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর বুট-শুদ্ধ পা দুটোকে তুলেই এলিয়ে পড়লেন একটা কাউচে।

পাখি আর টোটার মালা গলায় নিয়ে গৌরী তখনো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কী করতে হবে জানে না—বাপের আদেশের অপেক্ষা করছে সে।

—পাখাটা খুলে দে তো গৌরী। আর ওগুলো নামিয়ে রাখ মেজেতে।

গৌরী তাই করল।

—আয়, বোস্ আমার কছে—নৃপেন রায় ডাকলেন। গলার স্বরে মেশাতে চাইলেন স্নেহের নমনীয় আমেজ। সে স্বরে স্নেহ ফুটল কিনা বোঝা গেল না—কিন্তু গৌরী যেন আশ্বস্ত বোধ করল একটু। একটা টুল টেনে নিয়ে নীরবে বাপের পাশে এসে বসল।

—আজ খুব কষ্ট হয়েছে না রে?—আবার সস্নেহ স্বরে জানতে চাইলেন নৃপেন রায়।

—হাঁ বাবা—আস্তে আস্তে জবাব দিলে গৌরী।

মিষ্টি, ক্লান্ত গলার আওয়াজ। এতক্ষণ পরে মেয়েটিকে যেন দেখতে পাওয়া গেল ভালো করে। অলক্ষ্মীর মতো বব্-করা রুক্ষ চুলের পটভূমিতেও শান্ত কমনীয় একখানা মুখ। গভীর কালো চোখের তারায় ব্যথিত শঙ্কা। বাইরের পোষাকের সঙ্গে যেন কোনো মিল নেই তার মনের চেহারা।

আরো একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে—তার মুখে কোথাও যেন ভাবের স্পষ্ট আভাস নেই কিছু। কেমন প্রাণহীন। একটা জন্তুর মতো প্রাকৃতিক ভয়—প্রাকৃতিক দুঃখানুভূতি। কোনো ডাক্তার দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই বলে দেবে, মেয়েটা হাবা। তার শিশুর মতো অপরিণত চেতনা চিরকাল নীহারিকায় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, কোনোদিন অভিজ্ঞতার কঠিন আকৃতি-বন্ধনে পূর্ণ হয়ে উঠবে না।

প্রথমদিকে একবার ডাক্তার দেখানো হয়েছিল অবশ্য।

পরীক্ষা করে ডাক্তার শুধু মাথা নেড়েছিলেন বার কয়েক। তারপর ধিক্কারভরা চোখে নৃপেন রায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনার পাপেরই ও প্রায়শ্চিত্ত করছে, এর কোনো ওষুধ নেই।

—তার মানে?

—মানে এখনো জানতে চান?—ডাক্তারের মুখে ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল: জন্মের আগেই ওর সমস্ত জীবনকে আপনি নষ্ট করে রেখেছেন। আজ আর ওর ভালো করবার চেষ্টা বৃথা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন নৃপেন রায়। নিস্পন্দ হয়ে থেমে গিয়েছিল মুখের সমুচ্চ কঠিন হাড়ের সঙ্গে জড়ানো মাংস-পেশীগুলো। শক্ত থাবায় চেয়ারের হাতলটাকে ধরেছিলেন মুঠো করে।

—জানেন, কী বলছেন আপনি?

ডাক্তার ভয় পাননি। স্থিতপ্রজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে চশমাটা রুমালে মুছতে মুছতে বলেছিলেন জানি। যদি বিশ্বাস না করেন, আপনার আর আপনার মেয়ের ব্লাড দিয়ে যান। কাল কান্ টেস্টের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব—তা থেকেই আশা করি সব বুঝতে পারবেন।

জীবনে এই প্রথম থমকে গিয়েছিলেন নৃপেন রায়—যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। শিথিল হয়ে গিয়েছিল মুখের পেশীগুলো—মুঠিটা ঢিলে হয়ে এসেছিল চেয়ারের গায়ে। আর দাঁড়াননি তারপর।

ডাক্তারের টেবিলের ওপর প্রায় ছুড়ে দিয়েছিলেন ফী-এর টাকাগুলো। মেয়ের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলেছিলেন, চল্।

কিন্তু আর চিকিৎসা হয়নি গৌরীর।

চিকিৎসা করেও কোনো লাভ হবে না এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন নৃপেন রায়। কিছুদিন একটা গভীর অপরাধবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন

করে রাখল। তারপর ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই একটা জোর খুঁজে পেলেন তিনি। অন্যায় যদি তাঁর হয়ে থাকে, তবে তার প্রতীকারের দায়িত্বও তাঁরই হাতে। গৌরীকে তিনি জাগিয়ে তুলবেন। চেতনার আলো ছড়িয়ে দেবেন তার অন্ধকার মনের প্রান্তে প্রান্তে।

প্রাণ যদি নাই পায়—অন্তত অন্যদিক থেকে সজাগ করে তুলবেন একটার পর একটা নিষ্ঠুর হিংসার খোঁচা দিয়ে।

হিংসা! তাই বটে। কী বিরাট—কী প্রচণ্ড শক্তি! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যখন তাঁকে সামনা সামনি চার্জ করেছে, তখন সে শক্তির বিদ্যুৎঝলক টের পেয়েছেন রক্তের মধ্যে; শালবনের ভেতরে মাত্‌লা হাতী শিকার করতে গিয়ে সেই শক্তির উৎক্ষেপে দুলে উঠেছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। সেই শক্তি—সেই হিংসা। জীবনে নৃপেন রায় তার চেয়ে কোনো বড় জিনিসের কথা ভাবতেও পারেননি।

গৌরী জাগুক। কেটে যাক তার চৈতন্যের ওপর থেকে এই কুয়াশার আবরণ। তারপর ডাক্তারকে তিনি দেখে নেবেন।

আজও অস্পষ্টভাবে তাঁর মাথার মধ্যে যেন ঘুরে যাচ্ছিল এই চিন্তাটাই। আধবোজা চোখে গৌরীর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন আবিষ্টের মতো।

—হাঁস দুটো আজ বড় ভুগিয়েছে, না?

তেম্‌নি প্রাণহীন গলায় গৌরী বললে, হ্যাঁ বাবা।

—শিকারে যেতে তোর ভালো লাগে না?

—লাগে।

—কষ্ট হয় না?

—হয়। —গৌরী জানালার বাইরে আমগাছটার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে: অনেক কাঁটা আর বড্ড রোদ। হাঁটতে পারা যায় না।

—ওটুকু কষ্ট না করলে শিকারী হতে পারে কেউ? —উৎসাহে নৃপেন রায় দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ মুক্ত করে ধরলেন: শিকার কি আর ধরা দেয় অত সহজে? অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক রোদ কাঁটা সইতে হয়। একবার নেশা ধরলে দেখবি তুনিয়ার আর সব একেবারেই ভুলিয়ে দেবে।

—কিন্তু পাখী মেরে কী হয় বাবা?—গৌরীর নিষ্প্রাণ চোখে একটা জান্তব বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল: কেমন সুন্দর দেখতে! আর কী মিষ্টি করে ডাকে!

হঠাৎ একটা খোঁচা খেলেন নৃপেন রায়—চমকে উঠলেন কিসের অশুভ সংকেতে। উল্টো সুর বলছে গৌরীর গলায়। এমন কথা ছিল না—এমন হওয়া উচিত নয়।

কাউচের উপর উঠে বসলেন তিনি। মানসিক অধৈর্যে বুটপরা পা তুটোকে সশব্দে নামিয়ে আনলেন মেঝের ওপর। স্বগতোক্তির মতো পুনরাবৃত্তি করলেন গৌরীর কথা তুটোর: খুব সুন্দর দেখতে, না? খুব মিষ্টি করে ডাকে, কেমন?

হকচকিয়ে গেল গৌরী। নীহারিকার মতো অস্বচ্ছ মনের ধোঁয়াটে পর্দায় জান্তব ভীতির পূর্বাভাস পড়েছে। চাপা উৎকণ্ঠায় গৌরী বললে, হ্যাঁ বাবা!

—হ্যাঁ বাবা!—নৃপেন রায় বিশ্রীভাবে ভেংচে উঠলেন একটা। ইচ্ছে করল থাবার মতো তাঁর প্রচণ্ড মুঠিটা সজোরে বসিয়ে দেন মেয়েটার মাথার ওপর।

—আর খেতে কেমন লাগে? কেমন লাগে নরম তুলতুলে মাংসগুলো?—বিকৃত গলায় তিনি একটা তিক্ত প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন—চাবুকের আওয়াজের মতো যেন বাতাস কেটে গেল কথাটা।

সভয়ে গৌরী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

—কী, কথা কইছিস না যে? —পায়ের নীচে একটা কিছুকে থেঁতলে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে বুটজোড়া মেজেতে ঠুকলেন নৃপেন রায়।

প্রায় নিঃশব্দে জবাব এল গৌরীর: খেতে ভালোই লাগে বাবা।

—খেতে যা ভালো লাগে, তা মারতেও মন্দ লাগা উচিত নয়—হিপ্‌নটাইজ করবার মতো একটা নির্নিমেষ খরতা জ্বলতে লাগল নৃপেন রায়ের চোখে: যা, পাখিগুলোর পালক ছাড়িয়ে কেটে-কুটে তৈরী করে রাখগে।

—আমি?—ব্যথিত বিস্ময়ে গৌরী বললে, আমি তো কখনো করি না বাবা। ওসব তো বৃন্দাবন করে।

—না, আজ থেকে বৃন্দাবন আর করবে না, তোকেই করতে হবে: নৃপেন রায়ের সমস্ত মুখখানা মুছে গিয়ে গৌরীর দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে রইল শুধু দুটো আগ্নেয় চোখ: তুই-ই করবি এর পর থেকে। যা—

কলের পুতুলের মতো উঠে পড়ল গৌরী। তারপর পিঠের ওপর বাপের প্রখর দৃষ্টির উত্তাপ অনুভব করতে করতে তাড়া-খাওয়া একটা জানোয়ারের মতো পাখিগুলোকে তুলে নিয়ে ছুটে পালালো।

লাল হয়ে আসা শেষ রোদে বাগানের মধ্যে পায়চারী করছিলেন নৃপেন রায়। অদ্ভুত কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন সূর্য ডোবার আগেই কোথা থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা পাহাড়ী মথ্‌। বেশ বড় আকারের—প্রায় পাঁচ ইঞ্চি করে ফিকে নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা ডানা। মথ্‌টা ঘুরে ঘুরে কেয়াপাতার ওপর বসবার

চেষ্টা করছে—কিন্তু তারপরেই তীক্ষ্ণধার কাঁটার ঘায়ে উড়ে যাচ্ছে সেখান থেকে।

সুন্দর পাখা—খাসা রঙ। কিন্তু নির্বোধটা জানে না, এই কেয়াকাঁটার ঝাড়ে রঙীন পাখনা নিয়ে বসবার মতো জায়গা নেই কোথাও। হঠাৎ একটা অমানুষিক-আনন্দে নৃপেন রায় থাবা দিয়ে ধরলেন মথ্‌টাকে। মুঠির মধ্যে পড়তে না পড়তে সেটা পিষ্ট হয়ে গেল—হাতের তালুতে পরাগের মতো জড়িয়ে রইল একরাশ শাদা গুঁড়ো।

ফুলের পাঁপড়ি ছেঁড়ার মতো করে, ভোরের আকাশে নীলিমার বুকের ওপর প্রথম সূর্যের আলো পড়ার মতো শুভ্রতায় রেখায়িত পাখা দুটোকে তিনি নোখের ডগায় টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। বেশ লাগে ছিঁড়তে। অদ্ভুত সূক্ষ্ম—আশ্চর্য নরম। কিন্তু কেয়াগাছের একটি পাতাও অমন করে ছেঁড়া যাবে না, সে চেষ্টা করতে গেলে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাবে হাতের চামড়া—ভেসে যাবে রক্তের ধারায়।

বাগানের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সমস্ত মুখখানা খুশির আলোয় তাঁর ঝলমল করে উঠেছে।

এই তো! এতদিন পরে তবে ফুল ফুটেছে!

রাজপুতানা থেকে আনা, মরুভূমির বালিতে বেঁচে থাকা এই ক্যাক্‌টাস। কেয়ার চাইতেও বড় বড় খরমুখ কাঁটা। এদের ভীষণতার এইটুকুই মাত্র পরিচয় নয়। এই ক্যাক্‌টাসগুলোর আশে পাশে থাকে এক জাতের ছোট ছোট বেলে সাপ, যেমন দ্রুত, তেমনি অব্যর্থ তাদের বিষ! এই বিষকন্যার আজ যৌবন এসেছে, ফুল ফুটেছে এর গায়ে।

একটিমাত্র ফুল—মাঝারি ধরণের আনারসের মতো চেহারা।

হবিভ্রান্ত বর্ণে হালকা হালকা লালের ছোপ। কৌতূহলী হয়ে তার গায়ে হাত দিতে গিয়েই চমকে সরে এলেন নৃপেন রায়। হাতে লাগল কাঁটার তীক্ষ্ণ খোঁচা, জ্বালা করতে লাগল। তাকিয়ে দেখলেন মধ্যমার উপরে এসে জমেছে এক বিন্দু রক্ত।

নিজের রক্ত কতবার দেখেছেন—তবু এই একটি বিন্দুকে কেমন বিস্ময়কর বলে মনে হল তাঁর। আশ্চর্য স্বচ্ছ আর নির্মল দেখালো তার রঙ। নৃপেন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। এই রক্তে বিষ আছে—বিষ আছে তাঁদের নিজের অপরাধের! অসম্ভব।

হঠাৎ কান দুটো সতর্ক করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। গানের সুর। গৌরী গান গাইছে।

আঙুলে ক্যাক্‌টাসের বিষাক্ত জ্বালা নিয়ে অস্থির পায়ে ঘরের দিকে এগোলেন নৃপেন রায়।

বাইরের ঘরে একটা জানালার পাশে বসে বুড়ো আমগাছটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে গৌরী। কোলের ওপর তার দুটি সদ্যফোটা গন্ধরাজ। নিজের মনেই কী একটা গানের সুর সে গুঞ্জন করে চলেছে।

—গৌরী?

তীক্ষ্ণ গলায় তিনি ডাকলেন। বিদ্যুৎবেগে গৌরী দাঁড়িয়ে পড়ল, মাটিতে পড়ল কোলের ওপরে রাখা গন্ধরাজ দুটো।

—কী দেখছিলি?

—দুটো ঘুঘু বাবা। কী সুন্দর ডাকছে!—গৌরীর গলায় একটা আনন্দিত কৌতূহলের আমেজ। কিন্তু তাতে কোনো চেতন সত্তার বোধের চিহ্ন নেই। একটা প্রাকৃতিক অনুভূতি। নদীর নীল জলের আয়নায় নিজের ছায়া দেখে অর্থহীন আনন্দে ডেকে ওঠা কোনো হরিণের মতো।

—কোথায় ঘুঘু?—নৃপেন রায়ের চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

—ওই যে—গৌরী আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে: কেমন গায়ে গায়ে লাগিয়ে বসে আছে। এখুনি ঘু-ঘু করে ডাকছিল।

—ওঃ!

নৃপেন রায় সরে এলেন। তুলে আনলেন দেওয়ালের কোণায় ঠেসান দেওয়া বন্দুকটা। লোড করাই ছিল। আনলোডেড বন্দুক কখনো তিনি ঘরে রাখেন না।

গৌরীর হাতে বন্দুকটা তুলে দিয়ে বললেন, মার্—

হরিণের চোখে যেন বাঘের ছায়া পড়ল!

—বাবা!

—মার্—পাথরের মতো শক্ত শোনালো নৃপেন রায়ের গলা। জ্বলে উঠল সম্মোহকের দৃষ্টি। তারপর গৌরীর সামনে থেকে তাঁর সমস্ত মুখখানা মিলিয়ে গেল—জেগে রইল শুধু দুটো আগ্নেয় চোখ। সে দুটো যেন ক্রমশ বড়—আরো বড় হয়ে কোনো চলন্ত ট্রেনের দুটো আলোর মতো এগিয়ে আসত লাগল গৌরীর দিকে।

ঘামে ভেজা হাতে ঠাণ্ডা বন্দুকটা আঁকড়ে ধরল গৌরী। আস্তে আস্তে তুলে নিলে—লক্ষ্য ঠিক করল। তারপরেই একটা তীব্র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুটো তুলোর বলের মতো ঘুঘু জোড়া ছটফট্ করতে করতে পড়ল মাটিতে।

ঘর কাঁপানো একটা অট্টহাসিতে নৃপেন রায় ফেটে পড়লেন।

—খাসা টিপ হয়েছে তোর। বন্দুক ধরেই জাত-শিকারী!—অসীম আনন্দে আর একবার তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

কিন্তু গৌরী আর দাঁড়ালো না। দু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই নাকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়বার

মতো হাসিটা থেমে গেল নৃপেন রায়ের। না—এখনো হয়নি। এখনো অনেক দেরী। পায়ের নিচে গন্ধরাজ দুটোকে নির্মমভাব দলিত-মথিত করতে করতে তিনি ভাবতে লাগলেন—বাগানে একটাও ফুলের গাছ আর তিনি রাখবেন না। কালই কাটিয়ে নির্মূল করবেন সমস্ত। আর সেখানে পুঁতে দেবেন আরো গোটাকয়েক ক্যাকটাস্—আরো নির্মম, আরো কণ্টকিত।

দিন দশেক পরে বাড়িতে দুটো বড় বড় বাক্স এল। আর সেই সঙ্গে এল শক্ত তারের জাল দেওয়া একটা মস্ত বড় খাঁচা। খাঁচার মাঝখানে জালের আর একটা পার্টিশন—দুটো জানোয়ার পাশাপাশি রাখার ব্যবস্থা।

গৌরী অবাক বিস্ময়ে বললে, এতে কী হবে বাবা?

—মজা হবে।—নৃপেন রায় হাসলেন। হাতের তেলোয় একটা প্রজাপতি পিষে ফেলবার মতো হাসি। মজার চেহারাটাও একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাঠের একটা বাক্স খুলতেই খাঁচার এদিকের ঘরে লাফিয়ে ঢুকল মাঝারি ধরণের একটা লেপার্ড। পোষমানা নয়—বন্য এবং উদ্দাম।

—বাঃ, কী সুন্দর বাঘ!—খুশিতে ছলছল করে উঠল গৌরী : এ বাঘটা আমাদের?

—আমাদের বইকি।

আনন্দে গৌরী হাততালি দিলে : কী মজা। আর ওই বাক্সে?

দ্বিতীয় বাক্স থেকে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে সভয়ে গৌরী অব্যক্ত শব্দ করল একটা। খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াল। তারপর তীক্ষ্ণ শিস্‌টানার

মতো গর্জন করে হাত চারেকের মতো উঁচু হয়ে উঠল—বিশাল ফণা তুলে প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল খাঁচার দরজায়।

হাত আটেক লম্বা একটি শঙ্খচূড়। উজ্জ্বল, মসৃণ চিত্রিত দেহে আরণ্যক বিভীষিকা।

গৌরী পিছিয়ে যাচ্ছিল, নৃপেন তার হাতটাকে আঁকড়ে ধরলেন। এত জোরে ধরলেন যে গৌরীর হাড়টা মড়মড় করে উঠল।

—পালাচ্ছিস কেন—দাঁড়া। এইবারেই তো মজা শুরু হবে।

বাক্স যারা বয়ে এনেছিল, তারা একবার এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সরে পড়ল সেখান থেকে। শুধু আমগাছটার ছায়ার নিচে নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে ঝিমুতে লাগল বৃন্দাবন—সে চোখে দেখতে পায়না, কানেও শুনতে পায়না।

গৌরী বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাঁচায় ঢুকে বাঘটা সবে শ্রান্তভাবে বসে পড়েছিল—চাটতে শুরু করেছিল সামনের একটা থাবা। শঙ্খচূড়ের গর্জন শোনা মাত্র বিদ্যুৎবেগে সে উঠে দাঁড়াল।

প্রতিদ্বন্দ্বী তার পাশে—মাত্র এক ইঞ্চি সরু একটা জালের ব্যবধানে। সেই জালের ওপারে সে লতিয়ে লতিয়ে উঠতে চাইছে, তার চোখ দুটো এই দিনের আলোয়ও দু-টুকরো সিগারেটের আগুনের মতো জ্বলছে।

বাঘটা পায়ে পায়ে একেবারে খাঁচার এপারে সরে এল। একটা অতিকায় বিড়ালের মতো ফুলে উঠল তার গায়ের রোঁয়াগুলো। হিংস্র হাসির ভঙ্গিতে দাঁতগুলো বের করে চাপা স্বরে সেও একটা গর্জন করল। কিন্তু সে গর্জনে বীরত্ব প্রকাশ পেল না। তার চোখ দুটোয় ফুটে উঠল মর্মান্তিক ভয়ের ছায়া।

শিরদাঁড়া ধনুকের মতো বাঁকিয়ে নিয়ে সাপটা ফণা বিস্তার করল। তারপর আবার একটা তীব্র শিসের শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে

ছোবল মারল পার্টিশনের গায়ে। সমস্ত খাঁচাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল দুর্বলভাবে একটা থাবা তুলে লেপার্ডটা অস্ফুট গর্জন করল: গর্‌-রর্‌—

নৃপেন রায় মেয়ের দিকে তাকালেন। হাঁ—প্রাণ জেগে উঠেছে, ভাষা জেগে উঠেছে গৌরীর চোখে। ঝলমল করে উঠেছে কৌতূহলের আলোয়। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে একটা অদ্ভুত প্রত্যাশায়।

সাপটা এবার ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। উদ্ধত আহ্বানের মতো হেলতে লাগল ডাইনে বাঁয়ে। সিগারেটের আগুনের মতো চোখে ফুটে উঠল একটা বিষাক্ত নীলিম দীপ্তি! লেপার্ডটা একবার লেজ আছড়ালো—নির্ণিমেষভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শঙ্খচূড়ের দিকে—তারপর যেন মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্টিশনের ওপরে।

এইবার সাপটার পিছিয়ে যাওয়ার পালা। কিন্তু ভয়ের আভাস নেই—শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা। তারপরেই নিজেকে আবার দৃঢ় করে নিয়ে খাঁচা-ফাটানো ছোবল বসিয়ে দিলে।

বিদ্যুৎবেগে বাঘ সরে এল খাঁচার নিরাপদ কোণে। কান্নার মতো আওয়াজ তুলল: গর্‌-র্‌-র্‌—

গৌরী নেচে উঠল। হাততালি দিয়ে হেসে উঠল: বা-বা, কী চমৎকার!

তারপর সারাটা দিন ধরে চলল সেই অমানুষিক স্নায়ুযুদ্ধ। সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত হয়ে বাঘটা খাঁচার মাঝখানে এলিয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে তো ছুটি দেবে না গৌরী। একটা ছোট লাঠি দিয়ে বাইরে থেকে খোঁচা দিতে লাগল বারবার—আর বাঁচবার শেষ আকূতিতে থেকে থেকে ক্ষুব্ধ কান্নায় খাঁচার এদিক ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বাঘটা।

সারা দিনের মধ্যে গৌরীকে নড়ানো গেল না খাঁচার সামনে থেকে। হিংস্র আনন্দে থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল : কী চমৎকার!

অনেক রাতে গৌরীকে ঘুমন্ত খাঁচার সামনে থেকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গেল বৃন্দাবন।

রাত তখন প্রায় দুটো হবে। গৌরী উঠে বসল। রক্তের মধ্যে একটা অস্থির চঞ্চলতা। বিছানা থেকে সে নেমে পড়ল, সামনের টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলে নৃপেন রায়ের হান্টিং টর্চটা।

পাশের ঘরে বাবার নাকের ডাকের শব্দ। পায়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে। টর্চের আলোয় দেখা গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে সাপটা। বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খাঁচার কোণায়। অধৈর্যভাবে খাঁচার গায়ে কয়েকটা টোকা মারতে শঙ্খচূড় একবার নড়ে উঠল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না লেপার্ডের তরফ থেকে।

ছোট লাঠিটা কুড়িয়ে এনে বাঘকে খোঁচা দিলে গৌরী। নড়ল না, গর্জে উঠল না অসহায় যন্ত্রণায়। টর্চের তীব্র আলোয় বুঝতে পারা গেল—সীমাহীন ভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শিথিল স্নায়ু নিয়ে সে ঢলে পড়েছে।

কিন্তু শঙ্খচূড় উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে শিরদাঁড়ায় ভর দিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বী চাই তার। পার্টিশনের ওপর আবার একটা ভয়ঙ্কর ছোবল পড়ল—কিন্তু তার শত্রু আর নড়ল না। নড়বেও না আর।

হতাশায় ক্ষোভে গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সহ্য করতে পারছে না। তার সমস্ত জান্তব বোধকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে একটা প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র আনন্দ। উপায় চাই—উপকরণ চাই! নেশা চাই তার। যেমন করে হোক—যে উপায়েই হোক।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে গৌরী খাঁচাটায় সজোরে একটা ধাক্কা দিলে। সরল না। আর একটা ধাক্কা—আরো জোরে। খাঁচার কাঠের চাকাগুলো গড় গড় করে এগিয়ে গেল কয়েক পা। আর একটু ঠেলে দিলেই নৃপেন রায়ের দরজা। অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে নৃপেন রায় মেজের ওপরেই গড়িয়ে পড়ে আছেন—দরজা বন্ধ করে দেবার সুযোগ তাঁর হয়নি।

…শঙ্খচূড়ের গর্জনে আতঙ্ক-বিহ্বল নৃপেন রায় উঠে দাঁড়ালেন। তখনো নেশায় টলছেন, তখনও চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলেন আট হাত লম্বা আরণ্যক বিভীষিকা তাঁর মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে—হেলছে দুলছে, চোখে নীল হিংসার খরদীপ্তি!

একলাফে দরজার দিকে সরে গেলেন। টানতে গেলেন প্রাণপণে—দরজা খুলল না। গৌরী বাইরে থেকে শিকল বন্ধ করে দিয়েছে!

—গৌরী! গৌরী!

আর্তস্বরে নৃপেন রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। গৌরীর জবাব এল না—এল হাসির শব্দ। কাচের জানালার মধ্য দিয়ে সে ব্যাপারটা দেখছে। আর একটা নতুন খেলা—একটা নতুন আনন্দ! নেশা!

প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল সাপটা। আটত্রিশ বোরের রিভলভারটা ড্রয়ার থেকে বার করবার আর সময় নেই—শেষ চেষ্টায় সাপকে আঁকড়ে ধরতে গেলেন নৃপেন রায়। পারলেন না।

মণিবন্ধের ওপর দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করতে করতে দেখলেন কাচের জানলায় হাততালি দিয়ে দিয়ে হেসে উঠছে গৌরী। সে প্রাণ পেয়ে উঠেছে—কোথাও কিছু বাকি নেই তার। আর শঙ্খচূড় সাপের মতো তারও জান্তব চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আদিম হিংসার নীল আলোয়।

দরজা

আর একটা হাসপাতালের সামনে গাড়িটা এসে থামল। কপালের ঘাম মুছল মুসলমান কোচম্যান। আকাশে রুদ্র মূর্তি দুপুরের সূর্য। তপ্ত ঝোড়ো হাওয়ায় দিকে দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মরা পাতা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো। পীচ্ গলছে গাড়ির চাকার তলায়, ঘোড়ার নালে জড়িয়ে যাচ্ছে কালো কাদার মতো।

কাকের গলা শুকিয়ে আসা তৃষ্ণার্ত দুপুর। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ঘূর্ণি। প্রায় নির্জন দীর্ঘ পথটার ওপরে প্রতিফলিত রোদ একরাশ ছেঁড়া সেতারের তারের মতো ঝিলমিল করছে।

—আল্লা!--মস্ত একটা নিশ্বাস ছাড়ল কোচম্যান। তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিরক্তি। বেলা দশটা থেকে শুরু হয়েছে ঘুরপাক। এখন একটা বাজে। সারাদিনেও এ ঘূর্ণি ফুরোবে বলে ভরসা হচ্ছে না।

প্রথম দু একবার কোচবাক্স থেকে নেমে নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। এখন আর খোলে না। গাড়ির ভেতরে যে মেয়েটি বসেছিল সেও বুঝতে পেরেছে। তার জন্যে সব দরজাই বন্ধ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কেউই আর খুলবে না—কেউ না।

কিন্তু তবু তাকে চেষ্টা করতেই হবে। উপায় নেই তার—সময় নেই। হয়তো আজ—আজ না হলে কালই। কেউ তাকে বলেনি, তবু সে বুঝতে পেরেছে, বুঝেছে নিজের রক্তার্জিত সংস্কারে।

স্তনে দুধ আসবার সময় যেমন করে বুঝতে পেরেছিল, ঠিক তেমনিভাবেই।

কোচম্যানের অধৈর্য ডাক শোনা গেল: কই দেরী করছেন কেন? নামবেন না?

—হাঁ, নামব বই কি।—দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলে দিলে মেয়েটি। পেটের ভেতরে আবার সেই প্রাণশক্তিটা নড়ে উঠেছে, কয়েকটা আঘাত দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। অসহ্য যন্ত্রণায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইল যেন। দাঁতে দাঁত চেপে সে সহ্য করে নিলে যন্ত্রণার চমকটা, তারপর আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নামল ফুটপাথে, চুল এসে ছড়িয়ে পড়ল তার মুখের ওপরে। একবারের জন্যে সে যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখল সমস্ত, ইচ্ছে হল এই পথটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ে। না—তবু তাকে চেষ্টা করতে হবে। তার সময় নেই।

হাসপাতালের গেট দিয়ে ভেতরে চলে যাওয়া সেই ক্লান্ত পীড়িত মূর্তিটির দিকে সহানুভূতিভরা চোখে তাকিয়ে রইল কোচম্যান। আবার একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে বললে, আল্লা—করিম!—তারপর নেমে এল কোচবাক্স থেকে। পিপাসায় ফেনা দেখা দিয়েছে ঘোড়া দুটোর মুখে; গাড়ি থেকে তাদের খুলে নিয়ে সে চলল লোহার জলাধারটার দিকে। আহা, অবোলা প্রাণী!

কিন্তু মেয়েটি?

বেলা নটার ট্রেনে সে স্টেশনে নেমেছে। হাতের শেষ সম্বল চুড়ি দুগাছা বিক্রী করে যে ক'টা টাকা পেয়েছিল, তার ওপর ভরসা করেই ভাড়া করেছে গাড়িটা। তারপরে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের সন্ধানে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও তার জন্যে দরজা খুলল না।

পেছনের যে দরজা বন্ধ করে এসেছে—সেখানে ফেরবার কোনো

পথই তার নেই আর। কলঙ্কের কালো বাধা পাথরের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে সেখানে।

আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল—পারেনি। সে ভীরু, মরতে ভয় পায়। ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়িয়েও নিচের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে এসেছে। জামা কাপড়ে এক ডজন সেফ্‌টিপিন এঁটেও সে কেরোসিনের বোতলটা তুলে নিতে পারেনি হাত বাড়িয়ে; কড়ির আংটার সঙ্গে কাপড়ের ফাঁস বেঁধেও কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে বিমূঢ় চোখে—ভেবেছে আকাশ পাতাল, মনে পড়ে গেছে তার বয়েস মাত্র উনিশ বছর, তারপর আস্তে আস্তে খুলে নিয়েছে ফাঁসটা। সে আত্মহত্যা করতে পারেনি।

বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই। উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল বড় বোনের সংসারে। চল্লিশ বছরের ভগ্নীপতি—মুখে ঝাঁটা ঝাঁটা গোঁফ। চাকরী বাকরী করেনা—কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তারই দেখা শোনা করে। আর করে ধর্মচর্চা। কালী-কীর্তন গায়, কখনো কখনো রক্তবস্ত্র পরে, বলে, আমি সাধক। বিষয়-বাসনায় আমার মন নেই।

বিষয়-বাসনায় মন নেই, তবু সে তান্ত্রিক। ভৈরবী চাই তার।

এক বর্ষার রাত্রে ঘরে এল। দিদি তখন অঘোর ঘুমে মগ্ন। রাক্ষসের মতো শক্ত থাবায় মুখ চেপে ধরল তার। প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে শেষে সে জ্ঞান হারাল।

সে ভীরু—সে অসহায়। ছাইগাদার আড়ালে লুকিয়ে থেকে এক কাল-রাত্রিতে সে দেখেছিল বাড়িময় নাচছে মশালের উগ্র লাল আলো—তার বাবা, তার ভাইদের উঠোনে টেনে এনে দা দিয়ে কাটা হচ্ছে টুকরো টুকরো করে। পুতুলের মতো পলকহীন চোখ ফেলে দেখে গিয়েছিল সমস্ত—একবার চীৎকার করে ওঠারও

সাহস পায়নি। সেই থেকে একটা জান্তব ভয় স্থির হয়ে আছে তার বুকের ভেতরে, স্তব্ধ হয়ে আছে তার চোখের তারায়।

নিজের ঘরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল—একটা কথা বলতে পারলনা দিদিকে। তার পরের বার নয়, তার পরের বারেও নয়। প্রতিদিন একটা করে ছোরার আঘাত গায়ে লাগতে লাগতে শেষে যেমন সমস্ত বেদনাবোধই নিঃসাড় হয়ে যায়, তারও তাই হল শেষ পর্যন্ত। মৃতের মতো নিশ্চেতন স্নায়ু নিয়ে সে সহ্য করে যেতে লাগল ক্ষিপ্ত পশুটার আক্রমণ।

তারপর—

দিদির হিংস্র চিৎকার: মুখপুড়ী, সর্বনাশী! একেবারে ভিজে বেড়াল, এদিকে এত গুণ? সর্বনাশ বাধিয়ে বসে আছিস? তোর জন্যে কি এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে আমাদের? একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক করে এনেছিলাম, কিন্তু কে জানত: দিদির চিৎকার আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল: বেরো আমার বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যা। যে চুলোয় যেতে ইচ্ছে হয়—চলে যা সেখানেই।

ঘরের ভেতরে রক্তবস্ত্র পরে কালী-কীর্তন গাইছিলেন ভগ্নীপতি, এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে গেলনা। স্বরগ্রাম আরো উঁচুতে তুলে আবেগভরা গলায় তিনি গেয়ে চললেন:

"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে নাও,
ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে,
ডুব দে রে মন, কালী বলে—"

দেশ থেকে সব হারিয়ে আসবার সময় যে ছোট পুঁটলিটা সঙ্গে করে এনেছিল, সেইটে নিয়েই পথে নামল। একবার ইচ্ছে

হয়েছিল, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে থামিয়ে দেয় ওই কালী-কীর্তন, বুক ছেঁড়া চিৎকারে দিয়ে আসে তার শেষ জবাব। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল—কী হবে ? নিজের সব ভেঙেছে—তাই হোক্ ; দিদির সংসার ভেঙে দিয়ে কী লাভ হবে আর ?

আর এক জায়গায়। আর এক আত্মীয়ের বাড়িতে ; কালো সে—সে কুশ্রী। তবু বাড়ির বড় ছেলে একটু একটু করে আকৃষ্ট হচ্ছিল তার দিকে। কিন্তু তার মাতৃত্ব তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাড়ীর সতর্ক আবরণে পুরুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়—মেয়েদের দৃষ্টি এড়ানো যায়না।

—এ কেলেঙ্কারী আমার বাড়িতে সইবেনা বাছা। তুমি পথ দেখ।

আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত বড় ছেলেটি হুঙ্কার করে উঠল।

—নষ্ট, নচ্ছার মেয়ে! এক্ষুনি বাড়ি থেকে দূর করে দাও মা। আর বলে দাও, যদি কখনো এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসে, ঠেঙিয়ে দেব। মেয়েছেলে বলে রেয়াত করবনা।

অত কষ্ট আর করতে হয়নি বীরপুরুষকে। ও বাড়ির ত্রিসীমানায় যাওয়ার কোনো স্পৃহাই অনুভব করেনি সে।

আরো দু জায়গায় তারপরে। একজন শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছিলেন, দয়াও জেগেছিল তাঁর। কিন্তু স্ত্রীর শাসনে তাঁকেও স্তব্ধ হতে হয়েছে নিরুপায় ভাবে।

—তা হলে এ বাড়িতে একে নিয়ে তুমিই থাকো। আমি চলে যাই বাপের বাড়িতে।

না, কারোর ঘর ভাঙতে চায়না সে। আবার বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে ? স্টেশন থেকে স্টেশনে। প্লাট্‌ফর্ম থেকে প্লাট্‌ফর্মে—ওয়েটিং রুম থেকে ওয়েটিং রুমে।

একমাস কাটল গলার সরু হার ছড়া বিক্রীর টাকায়। কিন্তু

আর তো চলেনা। রক্তার্জিত সংস্কারেই সে বুঝতে পেরেছে, যেমন বুঝতে পেরেছিল স্তনে দুধ আসবার সময়। আজ কিংবা কাল। পেটের মধ্যে মধ্যে থেকে থেকে সেই অন্ধ প্রাণশক্তির নিষ্ঠুর আঘাত। বেরিয়ে আসতে চায়—মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু কোন্ পৃথিবীতে? কোন্ আলোয়?

গাড়িটা ঘুরছে সেই সকাল দশটা থেকে। চুড়ি বিক্রীর টাকাটা হয়তো ফুরিয়ে যাবে ওর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিতেই। তারপরে ফুটপাথ।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখবে সে। শেষ চেষ্টা।

ক্লান্ত মন্থর পায়ে মেটারনিটি লেখা ঘরটার ভেতরে সে পা দিলে। চারদিকে একটা তীব্র ওষুধের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে—খানিকটা উগ্র মাদকের মতো। ক্রিয়া করছে তার শিরা-স্নায়ুতে। সংকীর্ণ আর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি—নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পাচ্ছেনা সে।

পাশ দিয়ে কে একটি মেয়ে চলে গেল—বোধ হয় ঝি। হাতে একটা থালা, তাতে ভাত-তরকারীর ধ্বংসাবশেষ। সে দিকে তাকিয়ে তার চোখ চকচক করে উঠল, একটা মোচড় খেয়ে উঠল পেটের নাড়িতে। সন্তান নয়—অসহ্য ক্ষুধা। মনে পড়ে গেল, কাল রাত থেকে সে কিছুই খায়নি।

থাবা দিয়ে থালাটা নিয়ে নেওয়া যায়না ওর হাত থেকে? ওগুলো এঁটো—ফেলাই যাবে নিশ্চয়। অথচ ওরই এক মুঠো পেলে ক্ষিদের দুঃসহ জ্বালাটা তার আপাতত নিভত—নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে আরো খানিকটা সময় পেত সে। কিন্তু সে ভীরু। তার মনে, তার দুটি গভীর চোখে সেই কাল-রাত্রির ভয়, যে রাত্রে একটা ছাই গাদার আড়ালে বসে পলকহীন দৃষ্টিতে সে দেখেছিল, তার বাবা আর ভাইদের মশাল-

জ্বলা রাঙা আলোয় টুকরো টুকরো করে কাটা হচ্ছে তাদেরই উঠোনের ওপরে।

নিজের শুকনো ঠোঁটটা চাটল একবার। দেখল, পাশেই সুইং ডোর। অফিস। ওপরে একটা পাখার ঘূর্ণি তলায় দু তিন জোড়া জুতো আর মোজাপরা পা। বুকের মধ্যে অস্বস্তির চমক খেলে গেল একটা। মানুষ নেই—মোজা পরা পা। এমন ভয়ঙ্কর মনে হয় কেন কে জানে।

আস্তে দরজাটা ঠেলল। ক্যাঁচ করে তীক্ষ্ণ শব্দ হল একটা—যেন প্রতিবাদ করল দরজাটা।

হাউস্ সার্জন একটা কেস্ বোঝাচ্ছিলেন দুজন ছাত্রকে। তিন জোড়া চশমার আড়াল থেকে ছ'টি তরুণ চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল তার ওপরে।

—নমস্কার!—সে দু হাত জড়ো করে তুলল কপালে।

—কী চাই?—হাউস্ সার্জনের প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসার আগেই উত্তর এসে গেছে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে।

আসন্ন মাতৃত্ব আর এতটুকু প্রচ্ছন্ন নেই কোনোখানে।

—আমি একটা সীট্ চাই। ফ্রী বেড।

তিন জোড়া চশমার আড়ালে ছ'টি তরুণ চোখ আবার বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইল তাকে। তার শুভ্র নির্মল সীমন্তে সিঁদুরের ক্ষীণতম সংকেত নেই কোথাও; হাতে শঙ্খবলয় নেই। পরনের খয়েরী রঙের শাড়ী দেখে বুঝতে দেরী হয়না যে বৈধব্যের ছাড়পত্রও সে বয়ে আনেনি।

এক মিনিট চুপ করে থেকে হাউস্ সার্জন বললেন, আপনি একা এসেছেন? দাঁড়াবার জন্যে জোর খুঁজতে গিয়ে টেবিলের একটা কোনা সে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। কিন্তু সাহস পেলনা। নিজের অজ্ঞাতেই তার হাত দুটো সরে এল

সংকুচিত হয়ে, নিজের পায়ে ভর দিয়েই প্রাণপণে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল সে।

বোবাধরা গলাটাকে যথাসাধ্য আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতে করতে বললে, আমি একাই।

—আপনার স্বামী আসেননি?

এ প্রশ্ন আরো দু একবার শুনেছে সে—মিথ্যে জবাব দিতেও চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আরো দুটি একটি প্রশ্নের আঘাতেই ভিত্তিটা ধ্বসে পড়ে গেছে দুর্বল মিথ্যার। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে নগ্ন নিরাবরণ হয়েই যখন পৃথিবীর সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে, তখন আত্মরক্ষার ওই ক্ষীণ প্রয়াসটুকু একেবারেই অর্থহীন।

নিরুত্তেজ গলায় সে বললে, আমার স্বামী নেই।

অভিজ্ঞ হাউস সার্জন চোখ কুঁচকে তাকালেন একবার। ছাত্র দুটি নড়ে উঠল অস্বস্তিতে।

—আপনি বিধবা?—আর একটা বৈষয়িক নিরুত্তাপ প্রশ্ন।

—না।—কথাটা বলবার আগে আরো দু তিন জায়গায় সে বারবার দ্বিধা করেছে, কে যেন নিষ্ঠুর হাতে তার জিভটাকে টেনে ধরতে চেয়েছে ভেতর দিকে, মনে হয়েছে ত্রেতাযুগের মতো পায়ের তলার মাটিটা দু-ফাঁক হয়ে গেলে সে লুকিয়ে যেত তার আড়ালে। কিন্তু দেখেছে, মাটি আর এখন ফাঁক হয়না—আরো নির্মম কঠিনতায় নিশ্চল হয়ে থাকে। দেখছে, সে কথা না বললেও অন্যের মুখ থেকে চাপা ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসে হৃদয়হীন উত্তর: ইটস্ অ্যান্ ইল্লিগ্যাল কন্‌সেপশন দেন?

—না।—নিস্পৃহ স্বরে সে বললে, আমি কুমারী।

হাউস্ সার্জনের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না—মনে মনে এমনি জবাবের জন্যে তৈরি হয়েই ছিলেন তিনি। কথাটা শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামালেন, একটা টোব্যাকো পাউচ্ কুড়িয়ে নিলেন টেবিল থেকে। কিন্তু চমকে উঠল ছাত্র দুজন। জীবনে অভিজ্ঞতার পালাটা সবে সুরু হয়েছে ওদের—একজনের হাত থেকে স্টেথোটা শব্দ করে খসে পড়ল মেজের ওপর।

হাউস সার্জন বললেন, এক্সকিউজ মী। কোনো বেড নেই।

—আমি বারান্দায় পড়ে থাকব। মেঝেতে। শুধু দুদিন—মাত্র দুদিন—একটা পশুর কাকুতি বেজে উঠল তার গলায়!

—সরি। কোনো উপায় নেই।

একটি ছাত্র রুমাল বের করলে পকেট থেকে, কপালটা মুছে নিলে একবার।

—তা হলে কোথায় যাব আমি?—নিরর্থক জেনেও প্রশ্নটা না করে সে থাকতে পারল না। করতে সে চায়ওনি—তবু কখন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠেছে কথাটা।

—অন্য কোনো হাসপাতালে দেখুন।—হাউস্ সার্জনের স্বর উদাস: কোনো উপায় নেই আমাদের। দুঃখিত—মর্মান্তিক দুঃখিত। আচ্ছা—আসুন—

আরো কিছু তার বলবার হয়তো ছিল। কিন্তু নতুন কিছু নয়। বলা যায়—না বললেও ক্ষতি নেই।

—নমস্কার।

সে পিছন ফিরল। পা দুটো মাটির ভেতর যেন কংক্রীট জমিয়ে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, টেনে তুলতে হল তাদের। আবার তীক্ষ্ণ শব্দ করে খুলল সুইং ডোরটা—সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে।

আর একটা দরজা বন্ধ হল। হয়তো শেষ দরজা।

হাউস্ সার্জন বললেন, আসুন, ডিস্কাশনটা শেষ করে নিই।

যে ছাত্রটি রুমাল দিয়ে কপাল মুচছিল, তার দুটো চোখ জ্বল্জ্বল্ করে উঠল হঠাৎ।

—বেড তো ছিল একটা।

হাউস্ সার্জন হাসলেন: কিন্তু নট্ ফর্ হার। ওটা সতী স্ত্রীদের জন্যে। মেয়েটা বুদ্ধি করে কপালে খানিকটা সিঁদুর লেপে এলেও পারত। বুঝেও না বোঝার ভাণ করা চলত।

—কিন্তু ডক্টর—ছেলেটি চোখের সামনে একটা শীর্ণ গর্ভকাতর পীড়িত মুখ দেখতে পাচ্ছিল তখনও: মেয়েটা একেবারে হেল্‌পলেস্!

—আমরাও।—হাউস্ সার্জন একটা সিগারেট পাকাতে লাগলেন: এ সমস্ত বিশ্রী ব্যাপার ঢুকিয়ে শেষে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়বে কে? এসব অনেক দেখতে হয় এখানে। দু এক বছরের মধ্যে আপনাদেরও তো ডিউটির পালা আসবে—বুঝবেন তখন।

—কিন্তু মেয়েটা যে অত্যন্ত অ্যাড্‌ভান্স্‌ড্‌। কী উপায় হবে ওর?

—শি মাস্ট্‌ পে ফর হার সিন!—ঘরের মধ্যে একটা পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইলেন হাউস্ সার্জন: কী করব—আমাদের একটু সাবধান থাকাই ভালো।

না, আর কোনো উপায় নেই। স্বপ্নাবিষ্টের মতো আবার সে হাঁটতে লাগল। একটা দীর্ঘ করিডর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি আরো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—পৃথিবীটা আরো সংকীর্ণ আর সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে তার চারদিকে। এইবারে হয়তো ফুটপাথেই এলিয়ে পড়তে হবে তাকে।

কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যুকে সে চায়না—মরতে সে ভয় পায়। চোখের সামনে এখনো সেই কালরাত্রির বিভীষিকা জেগে আছে তার। ছাদের কার্নিশ—কেরোসিন তেল—হুকে বাঁধা দড়ির ফাঁসটা—কত প্রলোভনই তো ছিল সামনে। সে তাদের সুযোগ নিতে পারেনি।

—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। শিশুর কান্না। বুকের মধ্যে একটা শীতল বিদ্যুৎ বয়ে গেল তার। কে কাঁদছে? তার গর্ভের শিশু?

—ওঁয়া—ওঁয়া—

মার বুক। বাবার প্রসন্ন হাসি। নার্সও হাসছে। কেমন সুন্দর ছেলে হয়েছে আপনার। রাঙা জামা আসবে এরপরে। বেলুন—খেল্‌না—রঙীন্ দোল্‌না। খোকা দেয়ালা করছে ঘুমের মধ্যে। মার চুমু নেমে এল কাজলপরা চোখের ওপর। অন্নপ্রাশন। শানাই বাজছে—

ভুহাতে কান চেপে ধরে ছুটে চলল সে। আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ের শেষ শক্তিতে। এইবার শুধু মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়াই অবশিষ্ট আছে তার!

বাইরে জ্বলন্ত পৃথিবী। ঘূর্ণির দীর্ঘশ্বাসে ধুলো উড়ছে—পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে শুকনো পাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো। চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে আগুনের হল্‌কা।

কোচম্যান বসে আছে মূর্তির মতো। চোখের কোণায় ব্যথিত জিজ্ঞাসা সঞ্চার করে তাকিয়ে দেখল একবার।

গাড়িতে উঠে ভুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে। পেটের ভেতরে সেই নাড়ীছেঁড়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে আবার। আবার সেই অন্ধ প্রাণশক্তি মাথা খুঁড়ছে! সন্তান নয়—ঘাতক!

কোচম্যান জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাব এবারে? কতক্ষণ ঘুরব আর?

কোনো জবাব এল না।

বিকেল বেলা। শহরতলীর একটি ছোট মুসলমানী হাসপাতাল।

ডাক্তার হাসলেন: আদাব মিঞা সায়েব। আপনার বিবি?

—জী জনাব।

—ব্যথা উঠেছে দেখছি। আচ্ছা, এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।

এখন আর কোচম্যান নয়—গোলাম রহমান সে। গায়ে ফর্সা জামা—পরনে ধোপ-দুরস্ত লুঙ্গি। বিনীত হেসে বললে, আপনার মেহেরবানী।

—কী নাম বিবির?

—রোকেয়া।

—পাঠিয়ে দিন ভেতরে—

আর একটি দরজা খুলল। আর একটি নতুন শিশুর জন্মে।

নতুন গান

বাজার থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল রায় মশায়। গাঁজা পাওয়া যায়নি। শহরে আজ হরতাল। হালে আরো জোরালো হয়েছে নামটা—'আম হরতাল।' অর্থাৎ একটি মানুষ বাজারে যাবে না, একটা পান-বিড়ির দোকান পর্যন্ত খোলা থাকবে না কোথাও। এমনকি যে সব রুটি মাংসের দোকানগুলো এ পর্যন্ত কোনো দিন ঝাঁপ বন্ধ করেনি—সেখানে অবধি রাবণের চুলোয় আঁচ পড়েনি আজ।

এই চলবে। চলবে বেলা চারটে পর্যন্ত। গাঁজা না পাওয়ার ক্ষোভে দ্রুত পায়ে চলছিল রায় মশায়। কিন্তু খানিকটা হাঁটবার পরে কেমন অদ্ভুত লাগতে লাগল, হঠাৎ রায়মশায়ের মনে হল সব যেন কেমন বেসুরো ঠেক্‌ছে।

বয়স ষাটের কাছাকাছি—এর মধ্যে কি-না দেখেছে রায় মশায়! সেই যেবার সুরেন বাঁড়ুজ্জে এলেন, ভারী গোলমাল হল শহরে, চলল বে-পরোয়া লাঠিবাজি—সে সব কি ভোলবার কথা! এক একটা করে স্বদেশীর হাওয়া এসেছে ঘূর্ণিপাকের মতো, তচনচ করে দিয়ে গেছে সব—কত কাণ্ড হয়ে গেছে ওই অশ্বিনীকুমার হলে! তারপর কুলকাঠির সেই হাঙ্গামা—উঃ, সেকি দিন! বাতাস থমকে গেছে—কেঁপেছে আকাশ—কোন্‌খান দিয়ে আগুন যে লকলকিয়ে উঠবে কে তা বলতে পারে!

তারপর সেই দুঃস্বপ্ন এল। দেশ দু' টুকরো। তাতেও কোনো দুশ্চিন্তা ছিলনা রায় মশায়ের। সোজা মানুষ—সোজা বুঝ-সমঝ্। আরে বাপু, হিন্দুস্তান হোক আর পাকিস্তানই হোক, আমার কি আসে যায়। জমিদার নই, তালুকদার নই—সরকারী চাকুরেও নই। আমার গয়নার নৌকো চলুক—সোয়ারী যাতায়াত করুক—নগদ পয়সা গুণে দিয়ে যাক। হিন্দু যাত্রী হোক, মুসলমান যাত্রী হোক, দক্ষিণের মগ-ফিরিঙ্গিই হোক—সকলের পয়সার চেহারাই একরকম। তার ওপর ইংরেজীই লেখা থাক আর ফার্শিই লেখা থাক—টাকায় ষোলো আনা বুঝে পেলেই আমি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। মাধবপাশ-লাখুটিয়া-হিজলায় আবার সেই খুনোখুনি। গায়ের রক্ত জল করা সব খবর। ভয়ে একমাস গয়না বন্ধ রেখেছিল রায় মশায়—এমন কি গাঁজার নেশাও ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা। শেষে গায়ত্রী পর্যন্ত ভোলবার জো। সবে হয়তো 'ওঁ ভূর্ভুব' পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ শোনা গেল হল্লা—হয়তো মুর্গী চোর ভাম বেড়ালকে তাড়া করেছে কেউ ; কিন্তু তাতেই গুর গুর শব্দ শুরু হয়ে গেছে বুকের ভেতরে—গায়ত্রী সোজা গিয়ে উঠেছে ব্রহ্মতালুতে।

যারা ভেবেছিল কিছুতেই নড়বেনা, শেষ পর্যন্ত তারাও গিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠল এক্সপ্রেস স্টিমারে। রায় মশায়ের মনও ছট্‌ফট্ না করেছিল তা নয়। তবু রয়েই গেল। এই শহর, এই আকাশ-বাতাস, চোখ বুজে চেনা নদী-খালের প্রত্যেকটি বাঁক, কীর্তনখোলার টাটকা ইলিশ—এসব ছেড়ে কোথায় যাবে রায় মশায়? ঝাঁপ দেবে কোন্ অন্ধকারে ?

চল্লিশ বছর আগে ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পেয়েছিল—কোটালী-পাড়া থেকে—পাশ করেছিল গুরু ট্রেনিং। তারপর একটা ইস্কুলে গেল পণ্ডিতি করতে। কিন্তু বেশীদিন টিকলনা সেখানে।

সেক্রেটারীর ছেলেটা অত্যন্ত বাঁদর—হেড মাস্টারকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিড়ি খায়, অথচ একটা কথা বলবার জো নেই কারুর। রায় মশায়ের সইল না। একদিন ছেলেটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মনের সাধে বেতিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা।

মাস্টারি সেইখানেই খতম। তারপর কী করে যে এই গয়নার নৌকার ব্যবসা ফেঁদে বসল নিজেরই ভালো করে মনে পড়ে না। তবু চল্লিশ বছর এই নিয়ে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়েছে সে। কত বড় বড় বাবু, কত উকিল-মোক্তার, কত চাষা-চোয়াড় মানুষ, কত মোলা-মৌলবী, কত স্বদেশী, কত খুনী। অসহ্য দুঃখে সারা রাত চোখের জল ফেলতে ফেলতে কতজন তার নৌকোয় পাড়ি দিয়েছে, তাসের আর গানের হররায় রাত কাবার করেছে কত লোক। রায় মশায়ের নৌকোয় পয়সা ছাড়া কিছুই অচল নয়। আর অচল পয়সার কথাই যদি বলো, তা হলে ভালো ভালো বাবুদের পয়সাগুলোই ভালো করে দেখে নিতে হয়েছে তাকে। সিসের সিকি কিংবা কাণা আধুলি বাবুরাই পাচার করতে চেয়েছে সবচেয়ে বেশি।

এই খাল-নদীগুলো রায় মশায়ের রক্তনাড়ী—গয়নার নৌকোয় ডঙ্কার ডুম্ ডুম্ বুকের স্পন্দন, এই নৌকো তার প্রাণ। এর বাইরে তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ ছেড়ে কোথায় যাবে রায় মশায়? হিন্দুস্থান? যেখানে শুক্‌নো খটখটে মাটি—রোদ আর ধূলোতে ধূ-ধূ মাঠ (এ সব বর্ণনা রায় মশায়ের কল্পনা নয়, দস্তুরমতো ভালো লোকের মুখে শোনা)—সেখানে কী করবার আছে তার? হিজল আর নারকেল সুপুরীর ছায়া যদি কাজলের মতো খালের জলে নুয়ে না পড়ে, যখন তখন হাত বাড়িয়ে যদি বেত ফল সংগ্রহ করা না যায়, যদি খালের পাড়ের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দু-এক কুড়ি কাঁকড়া আর শলা চিংড়ি না জোগাড় করা যায়,

আর সবচেয়ে বড় কথা, গয়নার নৌকো চালাবার মতো তরতরে জলের সন্ধান যদি না মেলে, তবে—

তবে যেমন করে জলের মাছ ডাঙায় উঠে ছটফটিয়ে মরে যায়, ঠিক সেই দশাই যে হবে রায় মশায়ের! তাই সাত পাঁচ ভেবে থেকেই যেতে হল এ দেশে। আর নড়েই বা কী হবে? একটা ছেলে ছিল—পনেরো বছর আগে দেশ ছেড়েছে—তারপরে আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। আর স্ত্রী আছে ঘরে—দু চোখে ছানি পড়ে কিছুই প্রায় দেখতে পায়না। হিন্দুস্তান পাকিস্তান দুই-ই সমান তার কাছে।

মোটামুটি সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—আজ কেমন বেসুরো ঠেকছে। হরতাল। আম হরতাল। আগেকার দিনে হাজার ঝড় ঝাপ্টার ভেতরেও মুসলমানের দোকান খোলা থাকত ঠিক। আজ মুসলমানই ঝাঁপ বন্ধ করেছে সকলের আগে।

কী ব্যাপার? না, বাংলা আমাদের ভাষা—বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা চাই! হাঁটতে হাঁটতে নতুন বাজারের খালের ধারে এসে পৌঁছুল রায় মশায়। পুরোনো আমলে শ্মশান ছিল এখানে—এখন শ্যাওলাধরা আধভাঙা মঠের সারি। তার কাছেই গয়নার ঘাট।

কোনো কাজ নেই হাতে। সেই সন্ধ্যার সময় গয়না ছাড়বে—তার আগে পর্যন্ত ভারগ্রস্ত অবসর। কাজের মধ্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া। তাড়া নেই সে জন্যে।

—বাংলা আমাদের ভাষা—

—বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

রায় মশায় উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কলেজের দিক থেকে শোভাযাত্রা আসছে একটা।

—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করো—

—বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

রায় মশায় তাকিয়ে রইল। বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন হোঁচট লাগছে মাথার মধ্যে। কাদের মুখে এ কী শুনছে সে! বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রায় মশায় দেখতে লাগল—একটি হিন্দু ছেলেও ওদের মধ্যে কোথাও আছে কিনা!

অথচ মাত্র বছর দুই আগে—

রায় মশায়ের একটা অভ্যাস ছিল বরাবর। সে যে এক সময় কোটালীপাড়া থেকে পেয়েছিল সংস্কৃত উপাধি—সে কথা লোককে মনে করিয়ে দিয়ে ভারী আত্মতৃপ্তি পেত। এক একদিন রাতে যখন গুমোট হয়ে থাকত, এমনকি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পর্যন্ত উঠত না খালের জল থেকে—তখন যাত্রীদের কেউ কেউ বায়না ধরত—দু একটা শোলোক টোলোক শোনান না রায় মশায়!

আর কথা নয়—সঙ্গে সঙ্গে সুর করে রায় মশাই আরম্ভ করে দিত। কোনো কোনো দিন গাঁজার নেশা যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে চড়ে বসত, দু একটি রসিক যাত্রী থাকত নৌকোয় সেদিন আরো জমে উঠত।

যাত্রীরা বলত, ওসব ধর্মকথা ভালো লাগছে না রায় মশায়, রংদার কিছু ধরুন।

রংদার! তার জন্যে ভাবনা কী! সংস্কৃত হল রাজপ্রাসাদ। তাতে যেমন দেউল আছে, তেমনি আছে বাই নাচের আসর। অতএব রায় মশায় শুরু করে দিত 'গাহা সতসই', 'অমরু-শতক' কিংবা একরাশ উদ্ভট শ্লোক। একেবারে আদি অকৃত্রিম আদিরস।

—ওতে হবেনা রায় মশায়—বাংলায় ব্যাখ্যা করুন।

বাংলায় ব্যাখ্যা! শুরু হতেই কানে আঙুল দিত নিরীহ যাত্রীরা আর বাকি সকলের উৎকট অট্টহাসিতে খালের জল মুখরিত হয়ে উঠত।

সেবারও রায় মশায় মাঝরাতে গাঁজার ঝোঁকে স্তোত্র শুরু করে দিয়েছিল। হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে ধমক উঠল একটা। বিরক্ত হয়ে মৌলবী উঠে বসেছেন একজন।

—ওসব চলবেনা রায় মশায়, সেদিন আর নেই। উর্দু কিংবা ফার্সী গজল জানা থাকে তো শোনাও। নইলে চুপ করে থাকো।

চুপ করে রইল রায় মশায়। অনেক দিন মুখ খোলোন তারপর থেকে। মুখ খোলবার জন্যে তাগিদ দেবে, তেমন যাত্রীই বা কোথায় আর? ঠিক কথা—সেদিন আর নেই। সব বদল হয়ে গেছে।

গ্রামে মক্তব আছে। তার মৌলবীর সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। কথায় কথায় মনের দুঃখটা একদিন বেরিয়ে পড়ল তার কাছে। মৌলবী ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, আছে বটে ও-রকম দু-চারটে কাঠ মোল্লা। তা মন খারাপ করছ কেন সেজন্যে?

—না, মন খারাপ করছিনা।—রায় মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল একটা: সবই যখন বদলে যাচ্ছে, তখন আমাকেও বদলাতে হবে বইকি। দু-একটা উর্দু-ফার্সী শিখিয়ে দাও আমাকে! কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে—রাতে কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি না।

অগত্যা গোটা কয়েক বয়েৎ আর গজলের পাঠ দিলেন মৌলবী। বিচিত্র সুর—অজানা ভাষা। উচ্চারণ হয়না—সুরের মধ্যে উঁকি দেয় মহিম্ন স্তোত্র। তা হোক, যেমন দিন তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে বইকি নিজেকে। গয়নার নৌকো চেনা পথ ধরে তেম্‌নি যাতায়াত করে। তবু থমথমে মাঝরাতে—ঘন হিজল-বনের কালো ছায়ার তলা দিয়ে চলতে চলতে যখন শরীরে ছম্‌ছমানি লাগে, চল্লিশ বছরের অভ্যাস একটা অসহ্য আবেগের

মতো আছড়ে পড়ে গলার কাছে, তখন ঘুমন্ত যাত্রীদের চমক দিয়ে হঠাৎ সুর টেনে বয়েৎ সুরু করে রায় মশায়ঃ 'কদরে গোল বুল্‌বুল্‌ বেদানম্‌ ইয়া চম্বেরী'—

গোড়ার মুখে যাত্রীরা কেউ হেসে উঠত। কিন্তু এখন আর হাসে না। দু' চারজন নাম দিয়েছে 'রায়-মৌলানা।' একজন ঠাট্টা করেছিল, অতটাই যদি এগোলে, তা হলে এবার কল্‌মাটাও পড়ে নাও রায় মশায়। ওটুকু আর বাকি থাকে কেন?

প্রথম প্রথম নির্জীব হয়ে থাকত রায় মশায়। কিন্তু এখন সয়ে গেছে। গঙ্গাস্তবের মতোই সহজ হয়ে আসছে উর্দু গজলঃ 'ইন্‌সানোকে লিয়ে আজ ইন্‌সান্‌ চাহিয়ে।' এমন কি সুরও লেগেছে রায় মশায়ের গলায়। বয়েস বাড়লে মাথার চুল পাকে, তাকে ঠেকানো যায় না; তেম্‌নি দুনিয়ার হাল-চাল বদলে চলে তার নিজের নিয়মেই। কী করে তাকে রুখবে রায় মশায়? যা সহজ—যা আসবেই, সহজ ঔদার্যেই আসবার পথ করে দাও তার। সংস্কৃত ছেড়ে একদিন ইংরেজী শিখতে হয়েছিল—তেম্‌নি-ভাবেই উর্দু-ফার্সীও শেখা গেল না হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন নিজেকে বদল করে নিয়ে চলেছে—গানের বাণী কিংবা তার সুরেও যদি বদলের পালা এসে থাকে, তবে কেন তাকে মেনে নেবেনা রায় মশায়?

কিন্তু এ আবার কী? বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ?

রায় মশায় একটা ভাঙা মঠ থেকে একখণ্ড থান ইট টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বাংলা ভাষা! কে কবে মাথা ঘামিয়েছে তার জন্যে? কিছুদিন আগেও তো কয়েকটা মুসলমানী পুথি-পত্র খুলে চোখ প্রায় আকাশে উঠেছিল রায় মশায়ের। বাংলা ভাষায় সেগুলো লেখা—অন্তত হরফ থেকে তাই-ই মনে হয়। কিন্তু তার অর্ধেকেরও বেশি বোঝবার কোনো উপায়ই নেই।

অপরিচিত শব্দগুলো যেন সরকারী তোষাখানার সামনে সঙ্গীন্ তোলা সিপাইয়ের মত হাঁক ছাড়ছে ঃ হুকুমদার!

অথচ আজ—

কাউনিয়ার দিক থেকে কেদার ঘোষ আসছিল। রায় মশায়কে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে আস্তে আস্তে এগোল তার দিকে।

—কী খবর রায় মশায়? গয়নায়ও হরতাল নাকি?

রায় মশায় চমকে মুখ ফেরালো। বললে, আমার গয়না তো ছাড়বে সন্ধ্যের পর। বিকেল চারটেয় মিটবে হরতাল।

—বলা যায় না, হাওয়া বড় গরম।

—কী হয়েছে?

আর একখানা ইঁট টেনে নিয়ে কেদার ঘোষ রায় মশায়ের পাশে বসে পড়ল ঃ এই মাত্র খুব খারাপ খবর এসেছে ঢাকা থেকে। গোলাগুলি চলেছে।

—গোলাগুলি!—পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল রায় মশায়ের। হিজলা-লাখুটিয়া-মাধবপাশা। মানুষের সমস্ত মুখগুলো বদলে দানবের মতো হয়ে গেছে। ফকির বাড়ি আর বিবির মহল্লার দিকে আগুনের রঙে রাঙা হয়ে উঠছে আকাশ। অমানুষিক ভয়ে রায় মশায় বললে, গোলাগুলি! দাঙ্গা—?

—দাঙ্গা নয়, সে-সব আর হবেনা। পুলিশে গুলি চালিয়েছে।

—হিন্দুদের ওপর?

—না, মুসলমানদের ওপর।

মুসলমানদের ওপর গুলি চালিয়েছে পুলিশ! রায় মশায় হাঁ করে রইল কিছুক্ষণ। দুনিয়া বদলাচ্ছে—বড় বেশি তাড়াতাড়ি

বদলে যাচ্ছে। এই অসম্ভব দ্রুত গতির সঙ্গে কী উপায়ে পাল্লা দেবে রায় মশায়? পাকিস্তানে মুসলমানের ওপর গুলি চালাচ্ছে পুলিশে? এও কি বিশ্বাস করতে হবে?

—গুণ্ডার দল বুঝি?

—না। কলেজের ছাত্র—পথের মানুষ—

রায় মশায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। কলেজের ছাত্র! তারাই তো দেশের জঙ্গী-জোয়ান, তাদের হাতেই তো হাঁসিল হয়েছে পাকিস্তান। কতবার কত 'জুলুস' নিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে দেখেছে রায় মশায়। দীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা—সোজা মেরুদণ্ড, নির্ভীক পদক্ষেপ। হাতের এক মুঠিতে ঝাণ্ডা, আর এক মুঠিতে যেন বজ্র নিয়ে তালে তালে পা ফেলেছে তারা।

—পাকিস্তান কায়েম করো—

সেই বজ্রবাহীর দল—পাকিস্তানী ঝাণ্ডা আর তরুণের ডাণ্ডা হাতে সারা দেশের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে, আজ তাদের ওপরেই পুলিশে গুলি চালাচ্ছে! স্বপ্ন ছাড়া এ আর কিছুই নয়!

কেদার ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: কী যে হচ্ছে বুঝতেও পারছি না। আগে দোকানের নাম ছিল 'স্বরাজ ভাণ্ডার'—বদলে করেছি 'পাকিস্তান স্টোর্স।' এর পর জল কোথায় যে গড়াবে কে জানে!

রায় মশায় নিথর হয়ে রইল। আর একটা দল আসছে বোধ হয়—অথবা সেইটেই ঘুরে চলেছে খালের ওপর দিয়ে। ঝড়ের ডাকের মতো শোনা যাচ্ছে দূর থেকে: পুলিশ জুলুম বন্ধ করো। বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

কেদার ঘোষ পাংশু মুখে বললে, যাই দেখি দোকানে। বন্ধ তো করেই রেখেছি, আরো গোটা দুই তালা লাগিয়ে দিইগে! কে জানে লুটপাট শুরু হবে কিনা!

নির্জন শ্মশানে সারি সারি শ্যাওলা ধরা পুরোনো সমাধি। কয়েকটা গাছের ছায়া—স্যাঁৎসেঁতে মাটি। রায় মশায় ইতস্ততঃ চোখ বুলিয়ে মঠগুলোর ওপরের লেখা পড়তে চেষ্টা করল। খানিক দূরে বড় একটা ওঁ দেখা যাচ্ছে কিছুই পড়া যাচ্ছেনা তা ছাড়া। চোখের দৃষ্টি কি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তার—ছানি নামছে? হঠাৎ রায় মশায়ের মনে হল প্রত্যেকটা সমাধি থেকে এক একটা কালো ছায়া উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন—যেন কতগুলো অদৃশ্য বল্লমের ফলার মতো তাদের দৃষ্টি এসে গায়ে বিঁধছে তার। ওদিকের ওই তিন চূড়ো উঁচু মঠটার ওপর দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করছেন অশ্বিনী দত্তের একজন নামকরা শিষ্য—দেশের জন্যে কম করেও কুড়ি বছর জেল খেটেছিলেন তিনি। গম্ভীর গভীর গলায় তিনি যেন জানতে চাইছেন: কী হচ্ছে রায় মশায়—চারদিকে কী হচ্ছে এসব?

কী উত্তর দেবে রায় মশায়? দেখেছে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার রক্তমাখা দেহ—দেখেছে অনেক পিকেটিং আর হাঙ্গামা, শুনেছে মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান। কিন্তু এমন নতুন স্বদেশীর কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল? দেশ দু ভাগ হওয়ার পরে দেশের ভাষাকে ভালবাসতে শিখল মানুষ—রক্ত দিতে শিখল তার জন্যে! মুখের ভাত নয়—মুখের বুলির জন্যে এমন করে যারা ঝড় তুলতে পারে—কোথায় ছিল তারা এতদিন? কেন এতকাল তারা স্বদেশীর ডাকে এগিয়ে আসেনি—কে দায়ী তার জন্যে?

রায় মশায়ের শরীব শিরশির করতে লাগল। অনেক দূর থেকে এখনো শোনা যাচ্ছে ঝড়ের সেই গর্জনটা। আর এই কালো কালো ছায়ার তলায়—এই স্যাঁৎসেঁতে মাটির ভেতরে যেন একরাশ মৃতের জিজ্ঞাসা তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী বলবে রায় মশায়—কী জবাব দেবে কাকে?

বাজারের পথ নির্জন—একটি মানুষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু শূন্যতার মধ্যে লাল ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরছে একটা। রহমৎপুরের রাস্তার এধারে যেখানে রিকসাওয়ালাদের বড় একটা আড্ডা ছিল—সেখানে একটা চাকা ভাঙা রিক্‌সা কাত হয়ে আছে, আর কোথাও কিছু নেই। যেন তার চারদিকে মধ্য রাতের স্তব্ধতা নেমে এসেছে একটা।

রায় মশায় সভয়ে উঠে দাঁড়ালো। কেমন ঝিম ঝিম করছে শরীর—কেমন টিপ টিপ করছে মাথার ভেতরে। সকাল থেকে এক কলকেও গাঁজা জোটেনি। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এটা। কিন্তু গাঁজার নেশার চাইতেও তীব্রতর একটা নেশার প্রভাব পুঞ্জিত হচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে ঃ একটা আশ্চর্য আচ্ছন্নতা সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে তার সারা শরীরে।

গয়নার নৌকোয় আশ্রয় নেওয়াই নিরাপদ এখন।

মাল্লা-মাঝির দল যারা শহরে নেমে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসছে একে একে। নিয়ে আসছে নানারকম অস্বস্তি জাগানো সংবাদ।

—ঢাকায় হুলুস্থুলু কাণ্ড হচ্ছে। বিস্তর খুনোখুনি চলছে। এখানে মিছিল ভেঙে দিয়েছে—অনেক ধর-পাকড় করেছে। কী যে হবে শেষতক্—কেউ বলতে পারে না।

অসাড় একটা আড়ষ্ট শরীর নিয়ে চুপ করে পড়ে রইল রায় মশায়! এখনি তার পালাতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। সারাটা শহর যেন বারুদ দিয়ে ঠাসা—যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর সেই বিস্ফোরণে তার এই গয়নার নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে—তার এক চিল্‌তে কাঠও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবেনা সহজে।

—হারামীর বাচ্চারা!—কে যেন কাকে গাল দিয়ে উঠল।

একটা তীব্র জ্বলন্ত আক্রোশ লোকটার গলায়। সেই দাঙ্গার দিনগুলো। আকাশে-বাতাসে আগ্নেয় উত্তাপ। সামান্য একটু আওয়াজ কানে এলেই হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে যেতে যায়।

—এর বদ্‌লা চাই!—কোথা থেকে ক্ষিপ্তভাবে কে যেন চিৎকার করে উঠল। দুহাতে কান দুটো চেপে রইল রায় মশায়। বিবির মহল্লায় আবার কি আগুন লাগল নাকি? খালের জলে কী ভেসে যাচ্ছে ওটা? মরা কুকুর না মানুষের লাশ?

দু পাশের গয়নার নৌকোয় নানা উত্তেজিত আলোচনা। টুকরো টুকরো শব্দ। না—ওর একটা বর্ণও সে শুনতে রাজী নয়। কোনো প্রয়োজন নেই তার—কোনো স্বার্থও নেই। এই শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে সে বাঁচে—নিস্তার পায় এই অগ্নিবলয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে।

মাথার ভেতরে সেই আচ্ছন্নতা—সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অবসাদ। রায় মশায়ের চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসতে লাগল।

—উঠুন—উঠুন কর্তা। আর কত ঘুমুবেন?

রায় মশায় উঠে বসল ধড়মড় করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে।

—হোটেল তো খুলেছে। খেতে যাবেন না? এখুনি তো গয়না ছাড়তে হবে।

ঘোলা ঘোলা চোখ মেলে চেয়ে দেখল রায় মশায়। তারই গয়নার মাঝিরা ডাকাডাকি করছে তাকে।

—শহরের অবস্থা কী?—প্রথমেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

—ভালো নয় কর্তা। কাছারীর ওদিকে খুব গণ্ডগোল হয়েছে। আপনি যা হয় দুটি খেয়ে এসে চট্‌পট্‌ গয়না ছেড়ে দিন। বেশি রাত হলে—

বিস্বাদ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রায় মশায়।

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না আজ। চিঁড়ে-মুড়ি আছে, চলে যাবে ওতেই।—রায় মশায় একবার ইতস্ততঃ করল : তামাকের দোকান বুঝি খোলেনি?

মাঝিরা হাসল।

—সরকারী দোকান—ওকি আজ আর খোলে?

রায় মশায় দপ্‌ দপ্‌ করা কপালটা ছু হাতে টিপে ধরল। আর একটা—আরো একটা দীর্ঘ—বিলম্বিত রাত। বুকের রক্তে অস্থিরতার ঢেউ ভাঙছে। এই রাতে কী যে ঘটতে পারে তা অনুমানেরও বাইরে। অথচ এই দুঃসহ মানসিকতার মধ্যে কোথাও তার বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা নেই—এতটুকু অবলম্বন নেই আত্মলুপ্তির!

—ডঙ্কা বাজাও, ডাকো লোক—বিকৃত মুখে রায় মশায় বললে।

ডুম ডুম করে ঘা পড়ল ডঙ্কায়।

—সাহেবের হাট—সাহেবের হাট। চলে আসুন—

রায় মশায় কান পেতে শুনতে লাগল। কেমন অপরিচিত আর অলৌকিক মনে হচ্ছে ডঙ্কার আওয়াজটা। কালবৈশাখীর মেঘের মতো শহরের আকাশ। নতুন বাজারে ছু' একটা দোকানে আলো জ্বলেছে বটে, তবু যেন প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এই ডঙ্কার আওয়াজটা যেন স্তব্ধ স্তিমিত শহরের ওপর একটা অস্বাভাবিক আলোড়ন তুলছে আজ।

তবু যাত্রী এল। অন্ধকার শ্মশান-খোলার ভেতর দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো দুটি-একটি করে উঠে আসতে লাগল নৌকায়। আবছা চোখ মেলে দেখতে লাগল রায় মশায়। কিছু চেনা, কিছু আধ চেনা, কিছু অচেনা।

আজ সব কিছুই ব্যতিক্রম। অন্যদিন নৌকোয় উঠেই গল্প জমায়—তিন মিনিটের মধ্যে গুলজার করে তোলে। কিন্তু আজ যেন শহরের ওই জমাট বৈশাখী মেঘটাকে সবাই বয়ে এনেছে মনের ভেতরে। দু একটা টুকরো টুকরো কাজের কথা—সেও যেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে।

বারুদ ঠাসা এই শহর। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন বিস্ফোরণের সময়টা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। রায় মশায় ছটফট করে উঠল। পালাতে হবে এখান থেকে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—ডঙ্কা দাও, নৌকো ছাড়ো।

ডুম-ডুম-ডুম। সাহেবের হাট—সাহেবের—হাট—

গয়নার নৌকো নোঙর তুলল—লগির খোঁচ পড়ল মাটিতে। কয়েক হাত এগিয়ে যেতেই দু' দিকের দুখানা দাঁড়ে ঝিঁকে লাগল। এইবার সমস্ত নৌকোকে পেছনে ফেলে জাহাজের মতো চলবে গয়না—তর্ তর্ করে জল কাটবে—দশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়িয়ে যাবে শহরের চৌহদ্দি, জেলখানার উঁচু প্রাচীর আর বড় বড় পিপুল গাছের ছায়া।

রায় মশায় চোখ বুজে বসে রইল।

দশ মিনিট নয়, তার বেশি। এক ঘণ্টা? দেড় ঘণ্টা? আবার কি দু' চোখে অবসাদের ঘুম জড়িয়ে এসেছিল তার? কে যেন ডাকছে। চমকে চোখ মেলল রায় মশায়!

—রায় মশায় ঘুমুচ্ছেন?

—না, ঘুমুচ্ছিনা। —জবাব দিয়ে রায় মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে নৌকোর মধ্যে। যে ডাকছিল তাকে চিনতে দেরি হল না। সাহেবের হাটের মিঞা বাড়ির ছোট ছেলে আবু—এখানে কলেজে পড়ে। কখন তার নৌকোয় উঠল? সে তো দেখতে পায়নি।

আবু বললে, ঘুম আসছে না রায় মশায়—একটা গান-টান ধরুন।

—গান? —রায় মশায় গোটা দুই ঢোক গিলল পর পর। আজকের রাতেও কি কেউ গান গাইবার ফরমাশ করতে পারে? সমস্ত গান এখন গিয়ে আটকেছে গলার ভেতরে।

আবু বললে, লাগিয়ে দিন, লাগিয়ে দিন। সব মনমরা হয়ে আছে—জমিয়ে দিন একটু।

রায় মশায় তাকিয়ে দেখল দুধারে। শহর অনেক পেছনে পড়ে গেছে। তরল অন্ধকারে একদিকে সুপুরীর বন স্তব্ধ পুঞ্জিত —অন্য দিকে ধানের মাঠ।

গলা খাঁকারি দিয়ে রায় মশায় শুরু করলে, 'ইন্‌সানোকে লিয়ে আজ ইন্‌সান্ চাহিয়ে'—

—উঁহু, ও নয়, ও নয়! —মাঝপথে বাধা দিলে আবু, মানুষ আমরা চাই বটে, কিন্তু উর্দুতে নয়। দেশের মানুষকে ডাকতে চাই দেশেরই ভাষায়।

রায় মশায় থমকে গেল।

আরো তিন চারটি ছেলে গয়নায় উঠেছে আবুর সঙ্গে। কলেজের ছাত্রই খুব সম্ভব। সমস্বরে গলা তুলল তারা: হাঁ—হাঁ—দেশের ভাষায়।

—দেশের ভাষা? রায় মশায় অন্ধকারে চোখ মেলে কী একটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। চাকা কি উল্‌টো মুখে ঘুরছে আবার? পাকিস্তানের চেহারা কি বদলে যাচ্ছে রাতারাতি? এত কষ্ট করে শেখা উর্দু-ফার্শী কোনো কাজেই লাগবেনা তবে? এক বছর পরে রায় মশায় আবার সংস্কৃতকে ফিরে মনে আনতে চাইল। আবার গলায় আনতে চাইল সেই পুরোনো সুর:

"ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
গোপী-পীন-পয়োধর—"

তিন চারটি গলায় আবার ভেসে উঠল সমবেত প্রতিবাদ ঃ না রায় মশায়, সংস্কৃতও না।

তা হলে? তা হলে আর তো কিছু জানা নেই রায় মশায়ের। আর কোনো গান তো নেই তার গলায়। রায় মশায় বিমূঢ় হয়ে রইল।

আবু বললে, রায় মশায়, সংস্কৃত শিখেছিলেন সংস্কারে, উর্দু শিখেছিলেন দায়ে। কিন্তু প্রাণ থেকে যা শিখেছিলেন, সেই বাংলা ভাষার গান আমাদের শোনান। সংস্কৃত হিন্দুয়ানীর ছাপ মারা—উর্দুর চেহারা মুসলমানী। কিন্তু বাঙালি বাঙালিই—সে হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়। তার গান আমাদের সকলের গান।

বাংলা গান! রায় মশায় এবারেও একটা কথা বলতে পারল না। শুধু তাকিয়ে রইল অন্ধকার সুপুরি বনের দিকে—শুধু কান পেতে শুনতে লাগল দাঁড়ের আওয়াজ, খালের কালো জলের কলোচ্ছ্বাস।

আবু বললে, রায় মশায়, অবিশ্বাস করছেন কেন? মুসলমান এগিয়ে না এলে সংস্কৃতের বাঁধন থেকে বাংলা মুক্তি পেতনা—ইতিহাসে সে কথা আছে। আজ আবার মুসলমানই কি বেড়ী পরাবে তার পায়ে? সে কখনোই হতে পারে না। কোনো ভাবনা নেই রায় মশায়, আপনারা যদি গাইতে না পারেন, তবে আসুন, আমরাই তার সুর ধরিয়ে দিচ্ছি!

তীক্ষ্ণ জোরালো গলায় আবু গান ধরলে ঃ

ও আমার আমার বাংলা ভাষা গো—

শুধু আবু নয়,—বাকী তিন চারটি ছেলেও গলা মিলিয়ে দিলে তার সঙ্গে ঃ

ও আমার বাংলা ভাষা গো—

গয়নার নৌকোর সমস্ত যাত্রী এক সঙ্গে উঠে বসল—দুলে উঠল নৌকো, মাল্লাদের হাত থেকে খসে পড়ল দাঁড়। চমকে উঠল অন্ধকার সুপারীর বন—শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মতো দূর-দূরান্তে বয়ে চলল গান।

'ও আমার বাংলা ভাষা গো—

তুমিই আমার মনের আলো,

তুমিই আমার প্রাণের আশা গো'—

—ধরুন, ধরুন রায় মশায়—আবু প্রায় আদেশের সুরেই বললে, গেয়ে যান আমাদের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা—কিছুক্ষণ ভীরু গুঞ্জন। তারপরেই সকলের গলা ছাড়িয়ে রায় মশায়ের তীব্র কণ্ঠে বেজে উঠল: তুমিই আমার প্রাণের ভাষা গো—

—গয়না কার? থামাও বলছি—

সামনে কুদ্‌ঘাট। সেখান থেকে প্রায় আর্ত চিৎকার উঠেছে একটা। এসে পড়েছে জোরালো টর্চের আলো। দু জন পাহারাওলা নিয়ে বাউণ্ডে বেরিয়েছে দারোগা।

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল রায় মশায়—দম আটকে যেতে চাইল সীমাহীন আতঙ্কে।

—কার গয়না?—আবার সিংহ-গর্জন দারোগার।

—আমার।—প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললে রায় মশায়।

—তোমার? তুমিই তো গান গাইছিলে—না? দারোগার দাঁত কড়মড় করে উঠল: তা বেশ, নামো নৌকো থেকে। থানায় যেতে হবে তোমাকে।

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে রায় মশায়ের। থানায় যাওয়ার অর্থ কী বুঝতে বাকী নেই। আরো বিশেষ করে আজকের এই বজ্রগর্ভ রাত্রিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো থেকে বেরিয়ে এল আবু আর তার সঙ্গীরা। দপ্ দপ করে জ্বলছে আবুর চোখ।

—কেন যাবেন উনি থানায়? গান গেয়েছি আমরা—আমাদের সঙ্গে ওঁকে গাইতে বলেছি। কী দোষ হয়েছে তাতে?

দারোগার গলার স্বর নেমে এল।

—এ গান গাওয়া ঠিক নয়।

—কেন ঠিক নয়? গান গাওয়া কি বে-আইনি?

—না। তবু এই গান—

—এ গান কি বাজেয়াপ্ত?- আবু অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইল: যদি বাজেয়াপ্ত গান না হয়, তা হলে কোন্ সাহসে আপনি আমাদের বাধা দিতে আসেন?

—হক্ কথা!—নৌকোর আরো আট দশটি নিরীহ যাত্রী সাড়া দিয়ে উঠল সমস্বরে: ঠিক।

দারোগা অসহায়ভাবে তাকালো। কুড়ি জন লোক রুখে দাঁড়িয়েছে। কুড়িজন মানুষের গলা থেকে ঠিকরে পড়ছে দুঃসহ ক্রোধ—দুঃসহতর ঘৃণা।

নিরুপায়ভাবে একবার দাঁত কড়মড় করলে দারোগা। তারপরে বললে, আচ্ছা—যাও—

দু' খানা দাঁড়ে ঝিঁকে পড়ল, আবার খালের কালো জলের ওপর দিয়ে তরতরিয়ে ছুটে চলল গয়না। আশ্চর্য, এতক্ষণের স্তব্ধ গুমোট ভাবটা যেন কেটে গেছে এই মুহূর্তে—কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া, সুপুরীর বন, খালের জল যেন মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠেছে।

অনেক পিছে পড়ে গেছে কুদ্‌ঘাটা। দারোগার টর্চের আলোটা দেখা যাচ্ছে না আর।

আবু বললে, থামলেন কেন রায় মশায়, চলুক।

এবার শুধু আবুরা নয়, শুধু রায় মশায় নয়—আরো সাত আটজন গেয়ে উঠল সমস্বরে। খালের জল—ধানখেত—রাত্রি—আকাশ—সব যেন অবিচ্ছিন্ন ঐকতানে পরিণত হল একটা।

'ও আমার বাংলা ভাষা গো—
তুমি আমার মনের আলো,
তুমিই আমার প্রাণের আশা গো—'

এতগুলো মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে রায় মশায়ের গলাকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া গেলনা এবার॥

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।